KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : 28 চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৬
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন : (SAMAKALIN)	Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৩২/- ৩২/- ৩৩/- ৩৯/-	Year of Publication : বৈশাখ ১৩৯১ ॥ May 1984 কার্তিক ১৩৯১ ॥ Nov 1984 কার্তিক ১৩৯২ ॥ Nov 1985 কার্তিক ১৩৯৮ ॥ Nov 1991
	Condition : Brittle / Good
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের পত্রিকা

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

দ্বাত্রিংশ বর্ষ ॥ কার্ত্তিক ১৩৯১

সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ চিন্তার অনেকটা অংশ জুড়েই ছিল পল্লী উন্নয়নের চিন্তা। তাঁর সেই চিন্তার বাস্তব রূপ নেয় শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

আজ আমরা তাঁর সেই চিন্তাধারার শরিক। গ্রামগুলিতে যদি সভ্যতার আলো না পৌঁছোয় তবে দেশের সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। তাই পল্লী বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা গ্রামের মানুষের সেবায় ব্রতী। ইতিমধ্যে এরাজ্যের অর্ধেকেরও বেশি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এবং পর্ষদ সপ্তম যোজনাকালের মধ্যেই পশ্চিমবাংলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে স্থির। প্রসঙ্গত বিগত বছরগুলিতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ায় পল্লী বাংলার কৃষি কুটির শিল্প স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদিতে বিদ্যুৎ সংযোজনের পরিসংখ্যান ক্রমবর্ধমান। বিদ্যুতের ছোঁয়ায় শত শতাব্দীর অন্ধকার কেটে নতুন দিনের আবির্ভাবের শুভক্ষণ ত্বরান্বিত করেছে।

পল্লী সংগঠনে

॥ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ॥

দ্বাত্রিংশ বর্ষ ২য় সংখ্যা

সমকালীন

সমকালীন ।। প্রবন্ধের পত্রিকা

কার্তিক তেরশ একানব্বই

সূচিপত্র

রবিমামা দেয় হামা ।। নবেন্দু সেন ৪৫

গণিতের দর্পণে : ভারতবর্ষ ।। মুরারি ঘোষ ৫৯

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রমণী-সমাজ ।। রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী ৬৬

মহাভারতে দ্রৌপদীর মুখে লোকায়তবাদ ।। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর ৭৩

সমালোচনা : ভারতের জনসংখ্যা ।। মনোজ দত্ত ৭৭

শব্দের জগৎ ।। অধীর দে ৭৯

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক সুনীল প্রিন্টার্স, ২ ঈশ্বর মিল বাই লেন, কলকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-৮৭ হইতে প্রকাশিত।

সমকালীন

বর্ষ ৩২ কার্তিক ১৩৯১

রবিমামা দেয় হামা

নবেন্দু সেন

যুদ্ধ-দাঙ্গা আর দুর্ভিক্ষ-বিধ্বস্ত সমাজে স্বাধীনতার সুখ অপেক্ষা অভিশাপই উনিশ শো' সাতচল্লিশে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ পিতৃ-পিতামহের ভিটা ছেড়ে সম্পূর্ণ অনিকেত জিজ্ঞাসায় শহর কলকাতায় এসে ভেঙ্গে পড়েছিল। ভয়ে তাদের মেরুদণ্ড গিয়েছিল ভেঙ্গে, ধূলিসাৎ হয়েছিল নীতিবোধ। সহজেই রাজনীতির নামধারী শিকারী দালালদের হাতে পড়ে সর্বনাশের বরাতলে এগিয়ে যেতে বসেছিল। গোটা সামাজিক অর্থনীতি তখন অন্ধকারে নিমজ্জমান।

(১) এই সামাজিক চেহারার প্রতিফলন বয়স্ক সাহিত্যের মত ছোটদের সাহিত্যেও লক্ষিত হয়েছিল। এ সময়কার শিশুপত্র/পত্রিকাগুলির দিকে তাকালেই নানান খবর ও রচনা চোখে পড়ে যেগুলো এই মতেরই সমর্থন। ১৯৪৬ এর ২৭ বর্ষ, ৫ সংখ্যার মৌচাকে খবর প্রকাশিত হল :

"কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল—মুহূর্তে কলকাতার চেহারা গেল বদলে। কদিন কেবলই মনে হচ্ছে—ফিরে যাই সেইআদিম বর্বর যুগে। ক'দিন কলকাতার রাজপথে, বাড়ির কানাচে কানাচে রোল শুনেছি শ্বাপদের পদধ্বনি আর হত্যাকারীর চিৎকার। হিন্দু মুসলমান পরস্পরকে আঘাত করে, হত্যা করে, লুণ্ঠন করে, ধ্বংস করে, গৃহদাহ করে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। বাংলা ও ভারতের একদিকে এই হত্যাকাণ্ডের বীভৎস ছবি অপর দিকে তাকিয়ে দেখো—পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত হচ্ছে ভারতবাসীর জন্য।"

অন্নদাশঙ্কর এই শিশু পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই একটি আপাত মজার ছড়াকে দেশবিভাগের ঘটনাটি প্রচ্ছন্ন রেখে লিখেছিলেন দুটি বেড়াল ও একটি বানরের কথা। যথাস্থানে এ সম্বন্ধে আলোচনাও করা হয়েছে।

আবার শিশু-সাথীতে প্রকাশিত একটি গল্পে দেখা যাচ্ছে গ্রামবাসী দীনু শহরের ছেলে সঞ্জয়কে ('বাবু') চিনির শরবৎ দিলে সঞ্জয় গ্রামে চিনি পাওয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে দীনু বলে—

"এজ্ঞে, সবাই পাই না, যারা চৌকিদারী ট্যাক্স্ দেয়, তারাই কখন কখন—অল্প সল্প পায়। রেশন কার্ড দিয়ে আড়াই ক্রোশ রাস্তা হেঁটে...কিনে আনতে হয়। কেরোসিনও পাওয়া যায়, দু' বার দু ছটাক।...যেমন ভিড় তেমনি দোকানদার পাছু বেনে...পয়সা দিয়ে জিনিস আনতে যাই, মনে হয়, যেন ভিক্ষে করতে চাইছি।"

এই শিশু পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে জাত ধর্মের প্রশ্ন তুলে মানুষের কষ্ট লাঘবার্থে মায়ের নিকট বরাভয় প্রার্থনা করছে—"ক্ষুধার আগুনে যারা পুড়ে হল সারা/বাঁচাও তাঁদের—রাখো মা শরম লাজ।" মেদিনীপুর ও হুগলীর বন্যার ভয়াবহতার কথার সঙ্গে সঙ্গে নিখিল বঙ্গ গরু সম্মেলনের আপাত মজার রচনাও শিশু পত্র পত্রিকাগুলির সমাজমুখীনতাকেই চিহ্নিত করে। সেখানে।

"ষণ্ডরাজ বলতে লাগলো—মাননীয় সভাপতি এবং সমবেত গরু মহদয়া ও মহাশয় বৃন্দ। আজ আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই সভায় সমবেত হয়েছি তা আপনারা সবাই জানেন। আমরা আশা করেছিলাম ভারত স্বাধীন হবার পর আমাদের সর্ববিধ উন্নতি সাধিত হবে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আজ আমাকে বলতে হচ্ছে যে, ভারত সরকার আমাদের উন্নতির জন্যে এ যাবৎ কিছুই করেনি। আমাদের আজ বিশ্বাস করবার কারণ ঘটেছে যে, মনুষ্য-পরিচালিত সরকার আমাদের জন্য কিছুই করবে না।"—(কি. ভা. ১৪./১ সং, পৃঃ ২০৯)।

২। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বোঝা গেছে যে আলোচ্য পর্বের শিশু পত্র পত্রিকাগুলি নিছক পরীর গল্পে, আজগুবি আর অসম্ভবের ছন্দে, রূপকথা আর রাক্ষস খোক্কসের কাহিনী নিয়ে শিশুসাহিত্যের প্রবাহমান ঐতিহ্যই কেবল ধরে রাখেননি; যুগ বদলের অবশ্যম্ভাবী বৈশিষ্ট্যেও তা স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। গত তিরিশ বছরের শিশুসাহিত্যের যেখানে দেখা যাবে পুরোনো মৌচাক (১৯২০), শিশুসাথী (১৯২২), রামধনু (১৯২৭), মাস পয়লা (১৯৩৭), রঙ মশাল (১৯৩৭), শিশু সওগাত (১৯৩৮) স্বাধীনতা পরবর্তী যুগেও বেরুচ্ছিলো। নতুন বেরুলো শুকতারা (১৯৪৭), রোশনাই (১৯৬০), ঝিলিমিলি (?)। খুব অল্পদিনের জন্য হলেও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত দৈনিক শিশু পত্রিকা 'কিশোর' (১৯৫৮) এ সময়েই প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশিত হয়েছে নবপর্যায়ের সন্দেশ (১৯৬১)।

এই সব শিশুপত্র পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত আরেকটি বিষয়ও যা জেনে নেওয়া যায় তা হল দৈনিক সংবাদপত্রের শিশু বিভাগ। সপ্তাহে একদিন একটি পৃষ্ঠা ভ'রে ছোটদের উপযোগী রচনাদি প্রকাশিত হত। আনন্দবাজার পত্রিকায়, যেমন, 'আনন্দমেলা' নামে প্রতি সোমবার একটি শিশু বিভাগ থাকতো (প্রথম প্রকাশিত হয় ১৪ এপ্রিল ১৯৪০-এ)। তার সম্পাদক ছিলেন 'মৌমাছি'। প্রতি মঙ্গলবার প্রকাশিত হত যুগান্তরের 'ছোটদের পাততাড়ি' (১৯৫২)। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ছিলেন প্রথম দু' বছরের সম্পাদক। ১৯৪৫ থেকে সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন অখিল নিয়োগী অথবা 'স্বপন বুড়ো'। আবার রমেন দাসের সম্পাদনায় লোকসেবক পত্রিকায় প্রতি শনিবার প্রকাশিত হত 'সবুজসাথীর 'সবুজপাতা'।

উত্তরপর্বের প্রতিষ্ঠিত বহু লেখক লেখিকার সাহিত্যিক আবির্ভাব এই সমস্ত শিশু পত্রিকার পৃষ্ঠায় ঘটেছিল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, যেমন মাসপয়লায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। কার্টুন-

ধর্মী শিশুরচনার প্রথম-প্রকাশও অনন্দমেলার পৃষ্ঠাতেই হয়েছিল।

আলোচ্য পর্বের শিশুপত্র পত্রিকাগুলির সঙ্গে পূর্ব পর্বের শিশু পত্রপত্রিকাগুলির একটি চারিত্রিক পার্থক্য লক্ষিত হয়। বালক বন্ধু থেকে মুকুল ও সন্দেশের কাল পর্যন্ত দেখলে দেখা যাবে সেখানে প্রধানতঃ সমকালীন ধর্মান্দোলনের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রভাব যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। মুকুল থেকে স্বদেশ-প্রীতি ইংরেজ সরকার বিরোধী মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। মৌচাক ও শিশুসাথীতে দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধে বিধ্বস্ত সমাজমুখীনতার কথা প্রকাশিত হয়েছে। তারপর থেকে আলোচ্য পর্ব পর্যন্ত প্রকাশিত অধিকাংশ পত্রপত্রিকাই এই সমাজসচেতনাতে পুষ্ট। এর সঙ্গে অবশ্য পুরাতন জ্ঞান ও আনন্দময়তার কথাও যুক্ত হয়েছিল। এই সমস্ত পত্রপত্রিকায় এবং স্বতন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত শিশু সাহিত্যিকদের তিনটি দলে দেখা সম্ভব। ক, মূলত শিশুসাহিত্যিক, যথা : স্বপন বুড়ো, মৌমাছি, লীলা মজুমদার, রবিদাস সাহা রায়, সত্যজিত রায়, ধীরেন্দ্রলাল ধর : খ, মূলত বয়স্ক জগতের সাহিত্যিক কিন্তু শিশু সাহিত্যের রচনাতে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যেমন : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব ও অচিন্ত্য, শিবরাম, বিভূতি মুখোপাধ্যায় : সাম্প্রতিক কালের মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, কবিতা সিংহ, শৈলেন ঘোষ, বুদ্ধদেব গুহ, মতী নন্দী প্রভৃতি।

তৃতীয় দলে প্রধানত শিক্ষাবিদ, গবেষক, প্রাবন্ধিক অথচ শিশুসাহিত্য সৃষ্টিতেও সম পারদর্শী। এ দলে আছেন শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'শ্যামলা দীঘির ঈশান কোণে, ছুটির দিনে মেঘের গল্প (১৯৫৬), রাজকন্যার ঝাঁপি (১৯৪৫), শঙ্খ ঘোষের সকাল বেলার আলো (১৯৭২/'৮২), শিশিরকুমার দাশ তাঁর সোনার পাখি (১৯৫২/৬১) এবং তারায় তারায় (১৯৬০) নিয়ে।

৩। এই সমস্ত লেখকের রচনা অবলম্বনে আমরা সাম্প্রতিক শিশুসাহিত্যের একটি সাধারণ পরিচয় গ্রহণ করতে পারি। প্রথমেই ধরা যাক একালের সেই সমস্ত রচনার কথা যেগুলি পুরাতন অথবা প্রচলিত গল্প কাহিনীর নব নির্মিত রূপ। এই রি-কনস্ট্রাকশন সাম্প্রতিক শিশুসাহিত্যের একটি রূপ ও রসগত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি দুটি উদাহরণ নিয়ে বিষয়টি বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। ধরা যাক অন্নদাশঙ্করের 'দুটি বেড়াল একটি বানর' শীর্ষক ছড়াটি। ছড়ার পাত্র পাত্রী হুলো, ভুলো এবং লছমান দাস যথাক্রমে বেড়াল ১, বেড়াল ২, এবং বানর। হুলো ও ভুলো প্রচণ্ড কলহে লিপ্ত। কারণ দু' জনেই চায় নিজেদের সম্পূর্ণ ভাগ। অতএব ভুলো বলে।

'তবে রে দুরন্ত দেখি তোর দন্ত/হুলো উত্তর দেয় "তুই এক গুণ্ড নেব তোর মুণ্ড"। এসময় দু'জনের মহাবন্ধু রূপে লছমন দাসের আবির্ভাব। সে বল্লে 'আচ্ছারে আচ্ছা বেড়ালের বাচ্চা সুবিচার করব একদম সাচ্চা।" তোরা দুই বিল্লী চল তবে দিল্লী। এর পর সকলের দিল্লী আগমন। দিল্লী এসে লছমন দাস বল্লো 'হুলোকেই ভালবাসি সবচে বেশী/আমি বিদেশী।" হুলো জিজ্ঞাসা করে—"কাকে?" লছমন দাস সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় 'ভুলোকেই ভালবাসি সবচে বেশী/আমি বিদেশী।" এবার হুলোয় আবার জিজ্ঞাসা এবং লছমন দাসের সমীকরণ : "হুলোকেই ভুলোকেই হুলোকেই ভুলোকেই"

হু—ভু—হু—ভু—
হুভুলোকেই ভালবাসি সবচেয়ে বেশী আমি বিদেশী।

এর মধ্যে হলো এবং ভুলো আবিষ্কার করে "অথও গেলরে/ইথিও গেলরে।"

গল্পটি প্রচলিত লোককথা ভিত্তিক। কিন্তু ১৯৪৭-এ লেখা অন্নাশঙ্করের ছড়ায় তাৎপর্য বহন করে দিল্লীতে বিদেশী লছমান দাস কর্তৃক হলো ভুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব মেটানোর ক্রিয়াকর্মে। শেষ মুহূর্তেও হলো ভাবে "পিঠে হলো নিঃশেষ তবু করি বিশ্বেস হবেনা হবেনা ভাগ, সেইটেই মুখ্য" এবং ভুলো ভাবে "পিঠে...বিশ্বেনা/সবটা পাবে না হলো, সেইটেই মুখ্য মুখ্য।" দেশবিভাগের ঘটনাকে প্রচ্ছন্ন রূপে হলেও স্মরণ করায় এই ছড়া; এবং ছড়াটি অবলম্বনে আমরা "বানরের পিঠে ভাগ" নামক লোককথার উৎসেও পৌঁছে যাই। এই প্রচলিত গল্পকথার নবীকরণকেই আমরা reconstruction বলছি। এর আর একটি সুন্দর উদাহরণ বুদ্ধদেব বসুর 'হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালার মধ্যে পাই'।১

সেখানে পাইড্ পাইপার দ্বিতীয়বার বাঁশি বাজিয়ে নগরের সমস্ত ছেলেমেয়েদের ঘর-ছাড়া করে মরণ নদীর জলে ডুবিয়ে দেবার গল্পটির পূর্ব মুহূর্তেই 'বাপ্পা'র মত ছোট শ্রোতা কেঁদে উঠতেই 'রঙ্গুদা'র মত একটি চরিত্রের আবির্ভাব হয়; এবং তিনি গল্পের মোড় ঘুরিয়ে নতুন কাহিনীর সূত্রপাত করেন। তাতে বলা হল: হ্যামেলিন শহরে প্লেগ ছড়ালে মেয়র প্রতি ইঁদুর প্রতি চার আনা পুরস্কার ঘোষণা করে ইঁদুর মারার উৎসাহ দিয়েছিলেন। তারপর বহুকাল কেটে গেছে। পৌরসভার রেকর্ড বুকে সে আইনটি থেকে যায়। হান্স লবেটা নামক লোকটির চোখে সেই রেকর্ড বুকের খবরটা পড়তেই বেকার হান্স দীর্ঘদিনের চেষ্টায় ৪০২০০ ইঁদুর মেরে তার প্রাপ্য দাবী করলো। কর্তৃপক্ষ হান্সের নামে অভিযোগ আনলেন। ঐ মৃত ইঁদুর নদীর জলে নিক্ষেপ করে স্থানীয় লোকের স্বাস্থ্যহানি করেছে; মৃতদেহ ছিটিয়ে পৌরসভা নোংরা করেছে, বিনানুমতিতে কার্লমান হাইপের গাছ কেটেছে এবং হান্সের পাগলামি দেখার জন্য শহরের সমস্ত লোক একত্রিত হওয়ায় দোকানপাট বন্ধ হওয়ায় অসুবিধা ঘটিয়েছে। অতএব তার জরিমানার অর্থবাবদ সমস্ত প্রাপ্য অর্থ কেটে পঞ্চান্ন টাকা চার আনার রসিদ দিয়ে সে অর্থ নিয়ে যেতে আদেশ দেওয়া হল তাকে। বিমর্ষ হান্স বাকি দিনগুলো ছোটদের সঙ্গে গল্পগুজুব করে কাটায়। সে মারা গেলে ছেলেমেয়েগুলি কফিনের সঙ্গে গীর্জায় গিয়েছিল। তারা হান্সকে পাইড পাইপার বলে ভাবতো।—এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় বুদ্ধদেবের 'দস্যুর দলে ভোমরা' বইতে 'দুষ্টু' চরিত্রটি অর্জুনের মৃত্যু মেনে নিতে পারে নি। শিশুমন বুদ্ধদেব এমনি করেই বুঝতেন। তাতেই রচিত হল এই নবীন হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালার গল্প। কিন্তু গল্পটি গড়তে গিয়ে পাঠকের মনে উৎসের গল্পটি ভেসেও ওঠে। এখানেই কিন্তু reconstructed story-র সার্থকতা।

৪। বুদ্ধদেব-প্রেমেন্দ্র (মিত্র) এবং অচিন্ত্য (সেনগুপ্ত) এ পর্বের প্রথম দিকে ছোটদের জন্য লিখেছেন। বুদ্ধদেবের রচনা এঁদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি বৌদ্ধিক। বিচিত্রমুখীন প্রতিভার অধিকারী বৈদগ্ধ্য প্রবীণ বুদ্ধদেব দেশী বিদেশী শিশুসাহিত্যের বর্ণময় সম্ভারে আরো সমৃদ্ধ করেছেন এই শাখাটিকে। তবে তাঁর অনেক রচনারই আবেদন বড়দের নিকট। যেমন তাঁর "রঙীন কাচের প্রাইজ" গল্পটি। শিবু প্রাইজের স্তূপীকৃত বই নিয়ে হোস্টেলে ফিরে দেখে বাড়ির কোন চিঠি সেদিন আসেনি। বিষণ্ণ মনে প্রাইজের বইগুলো নামিয়ে রেখে চুপ করে শুয়ে পড়ে। কিন্তু হোস্টেল সুপারের ছোট ছেলেটি তার ঘরে এসে ঘ্যান ঘ্যান করে। শিবু বিরক্তিতে ছেলেটিকে বড় মারে। ছেলেটি কাঁদতে

থাকে। শিবু তখন তার নতুন প্রাইজের বইগুলি সব দিয়ে দেয় তাকে। তারপর আলো নিভিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকে।—এটি গল্প না হয়ে কবিতাও হতে পারতো। সেই mood নির্ভর রচনা। এর আবেদন ছোটদের নিকট তেমন নয়। কিন্তু তাঁর নাটক—? যেখানে 'রাম রাবণের যুদ্ধে' রাবণরূপী রবিকে রাম বেশী মণ্টু মারলে রবি যখন আর ওঠে না; লঙ্কাবাসীদের কান্না শেষ হয়ে গেলেও নড়ে না যখন তখন মণ্টু রবির গলা জড়িয়ে কেঁদে ওঠে। রবি তড়াক করে উঠে বসতেই সকলে মণ্টুকে ক্ষেপায়। মণ্টু তখন রাগে অন্ধ হয়ে রবিকে কিল চড় মারে এবং বলে, পাজি পাজি তুই কেন মরলি না?"

এটি কোন মহৎ নাটক নয় ঠিকই; কিন্তু মহৎ শিশু শিল্প। বুদ্ধদেব এখানে লীলা মজুমদারের মত। অভিমান দিয়ে শিশুসাহিত্যের মজায় ঐশ্বর্য সাজিয়ে তুলেছেন। ছোটদের মনের গভীরে না পৌঁছুলে এ মায়া রচিত হয় না। বুদ্ধদেবের সার্থকতা সেই পৌঁছুনোর মধ্যে।

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত (১৯০৪-'৭৬) ছোটদের জন্য কম লিখলেও তাঁর গল্পগুলি বাস্তব ও আদর্শবোধে ছোটদের মনেও যেমন বড়দের মনেও তেমনি গভীর দাগ কেটে যায়। যেমন ধরা যাক 'স্বদেশী ডাক্তার।' অতুল ডাক্তারী পাশ করে ক্লিনিক খোলার সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত লতায় পাতায় সম্পর্কিত এবং অসম্পর্কিত আত্মীয়দের ভীড়ে এবং বিনাপয়সায় তাদের চিকিৎসা ও ওষুধের সমস্ত ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়ে যখন পেশা ও সমাজ ব্যবস্থার প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠেছিল সে সময় একদিন বস্তির একটি দরিদ্র ছেলে তার মরণাপন্ন বাবার অসুখের জন্য ডাকতে এল। অতুল তাকেও ব্যঙ্গ করে নিজের আত্মীয় বলে তার অসুস্থ পিতাকে দেখতে গিয়ে ইনজেকশন দিয়ে বাঁচিয়ে তুললো। ছেলেটি তখন অতুলকে বিস্মিত করে দুটি টাকা ভিজিট দিতে গেলে অতুল তাকে সত্যিই আত্মীয় জানে ধমকে সে টাকা না নিয়ে রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা করতে বলে চলে আসে।—গল্পের বক্তব্যে চমক আছে যেমন আছে মেম সাহেব গল্পে, যেখানে পাঁচি অবস্থা গুণে 'প্যানাজি' হয়ে বিলেত গেলে ধর্মপ্রাণা, গ্রামীণ দিদিমা কাত্যায়ণীকে (যাঁর হাতে বাবা মা মারা যাবার পর পাঁচি মানুষ হয়েছিল) সেখানে নিয়ে যাবার পরেই তাদের আধুনিক সংসারে তাঁর অনাবশ্যকতা প্রমাণিত হয়ে উঠল। জামাই কার্গো শিপে তাঁকে দেশে পাঠানোর কথা যখন ভাবছিল তখন হঠাৎ কমিশনারের স্ত্রী জেনির আবির্ভাব হল তাদের ফ্ল্যাটে। কাত্যায়নীকে 'পাগলি' বলে ওপরের ঘরে ততক্ষণে পাঁচি বন্ধ করে নিজেদের মানসম্মান জাহির করতে ব্যস্ত। বন্ধ ঘরে কাত্যায়ণী পূজার্চনায় মগ্ন। জেনি এসেই সেই পূজোর মন্ত্র শুনে সে ঘরে যায়। সেখানে কাত্যায়ণীকে ভারতবর্ষের প্রতীক, আত্মা জানে জড়িয়ে ধরে তাঁকে নিয়ে ভারতবর্ষে পাড়ি দেয়।—এ গল্পের রস অবশ্য বড়দেরো আপ্লুত করে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম ছোটদের বই ভয়ঙ্কর (১৯৩১), রোমাঞ্চ কাহিনী। ঐ বছরেই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর মজার বই পিঁপড়ে পুরাণ। তারপর হিমালয়ের চূড়ায় (১৯৩২), ঝড়ের কালো মেঘ (১৯৩৩), পাতালে পাঁচ বছর (১৯৩৪) প্রভৃতি বেরুতে থাকে। বেরুতে থাকে আকাশের আতঙ্ক (১৯৪২), ড্রাগনের নিশ্বাস (১৯৪৮), কুমির কুমির (রুশ ছড়া, ১৯৪৯), ময়দানব (১৯৪৯)। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান সম্ভবত ঘনাদা। ১৯৪৫-এ বেরুলো অদ্বিতীয় ঘনাদা। ১৯৬০-এ তাঁর পরাশর প্রকাশিত হওয়ার পরও ঘনাদার জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়েছে! লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ঘনাদার গল্পগুলিতে মশা, মাছি, পোকা, কাচ, নুড়ি, ছুঁচ প্রভৃতি তুচ্ছ, ক্ষুদ্র বিষয়গুলিই গল্প

বলার গুণে সবচেয়ে মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। একটি গল্প প্রথমে দেখা যাক।—'মশার মত তুচ্ছতম জীবটিকে হত্যার কথা বলতেই ঘনাদা থপ্ করে বলে বসেন—"একটি মাত্র মশাই জীবনে মেরেছি"—আর তারপরেই শুরু হয়ে যায় মশা মারার অপরাজেয় বীর গাঁথা। সে ১৯৩৯-এর ৫ আগষ্টের কথা; দক্ষিণে জাপান আর উত্তরে রাশিয়ার মাঝখানে করাতের মত পড়ে থাকা সাখলীন দ্বীপে যেবার কিছু অ্যাম্বার সংগ্রহের ইচ্ছায় ঘনাদার গমন হয়েছে। সেখানে হঠাৎ চীনা মজুর তান্‌লিনের নংগৃহীত অ্যাম্বার সহ একদিন অন্তর্ধান হলে তার খোঁজে জাপানী কীটতত্ত্ববিদ নিশিমারার ল্যাবরেটরীতে ঘনাদা ও তাঁর সঙ্গী মাটিনের হানা দেওয়া এবং সেখানে মারাত্মক বিষাক্ত মশার কামড় খাইয়ে তানলিনের প্রাণহীন দেহ রেখে দেওয়ায় ঘনাদা মুহূর্তে নিশামারার উদ্দেশ্য বুঝে নিয়েই নিজেদের প্রাণহননের আশঙ্কায় চকিতে প্রবল মুষ্ঠাঘাতে নিশামারার গবেষণার টেষ্টটিউব ভেঙ্গে ফেলেন। তার থেকে বেরিয়ে আসে সেই বিষাক্ত মশা। সে নিশামারাকে কামড়ায়। নিশামারা সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে। কাফ্রী চাকরটিও একই ভাবে মারা যায়। এবার মশাটি মাটিনের গালে বসতেই ঘনাদা বিরাশি সিক্কার একটি চড়ে মশাটি হত্যা করে সগর্বে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

এই গল্পটির মত ঘনাদার সব গল্পের কাঠামোই একরকম এবং মাইক্রোস্কপিক ভঙ্গীতে তুচ্ছ বিষয় অথবা জীব অবলম্বনে বৃহৎ ঘটনার গুরুত্ব বর্ণনার রীতিতে তারা সমগোত্রীয়। চারটি স্তরে এই গল্পগুলি বোনা। ১. শুরুতে ঘনাদার চালিয়াতি বুদ্ধির উপর টেক্কা দেওয়া / ঘনাদাকে চালমারার জন্য সমুচিত জব্দ করার পরিকল্পনা করা / ঘনাদার আজগুবি গল্পের হাত থেকে বাঁচার জন্য সংসারের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের অবতারণা করেন ঘনাদার মেসের বন্ধুরা। ২. ঘনাদা কর্তৃক এই তুচ্ছ ঘটনাকেও নিজের বর্ণনীয় পরিমণ্ডলের মধ্যে মুহূর্তের মধ্যে গ্রহণ এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যে বিচিত্র গল্পের অবতারণা। অসম্ভব চালিয়াতি তার মূলধন। ৩. জুল ভার্ণ, কনেন ডয়ালের অনুসরণে সাল তারিখ উল্লেখ এবং ভৌগোলিক তথা ঐতিহাসিক সত্য অক্ষুণ্ণ রেখে গল্পের বিশ্বাস যোগ্যতা সৃষ্টি। এ স্তরেই একটি রহস্য অভিযানের বর্ণনা স্থান পায়। ৪. রহস্য অভিযানের নায়ক ঘনাদার বিফলে সাফল্যে প্রত্যাবর্তন।—এইভাবেই গড়ে উঠেছে তাঁর শিশি, লাট্টু, জল প্রভৃতি গল্পগুলি। সায়ান্স ফিকশনের সঙ্গে 'কানে'র সংযোগে প্রেমেন্দ্র মিত্র যে অধ্যায়টি গড়ে তুললেন এখানে তার আবেদন বয়স্ক জগতের সমপরিমাণ।

এই যুদ্ধোত্তর যুগের সমাজ ব্যবস্থায় কল্লোল গোষ্ঠীর সাহিত্যবোধে কেবল রোমান্টিসিজমের মেদুরতা সর্বস্ব হয়ে ছিল না। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সদাগর পুত্র বসন্ত তাই তাঁর দাদাদের সঙ্গে বাণিজ্য করতে গেছে, দাদাদের ঠাট্টা, বিদ্রূপ সহ্য করেও সে মহৎ কর্তব্য করেছে—বুদ্ধভূতমের মধুরপঞ্জীর অভিযানের সঙ্গে আঙ্গিকের মিলটুকু থাকা সত্ত্বেও প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর হার্মাদে (১৯৭১) নতুন মানবধর্মের জয়ধ্বনি ঘোষিত করেছেন। হার্মাদ জলদস্যু চিরকালই সওদাগরদের শত্রু; হার্মাদদেরও শিকারের লক্ষ্য ছিল সওদাগরের নৌকা। নিষ্পত্তি ঘটেছে তার রক্তাক্ত নিষ্ঠুরতায়। উজ্জ্বল সাধুর নৌকোয়ও ফেলিপে নামক একটি হার্মাদের ছেলেকে জল থেকে তুলে বসন্তের তত্ত্বাবধনে রাখা হয় কিন্তু পরে ঠিক হয় তাকে হত্যা করে ফেলে দেওয়া হবে। বসন্ত সেই খবর পেয়ে ফেলিপকে রক্ষা করার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করবে বলে; কিন্তু ফেলিপ বসন্তের অনিষ্ট আশঙ্কা করে জোর করে একদিন চলে

যায়। বসন্ত ততোদিনে জেনেছিল ফেলিপে হার্মাদ ছিল না। তার বাবার মৃত্যুর পর হার্মাদরা মজুর হিসেবে তাকে রেখে তার উপর অকথ্য অত্যাচার করতো এবং সময়মত শিকারের সন্ধান না দেওয়ায় তাকে ছিঁড়ে ফেলার হুকুম দেয়। ফেলিপে সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ে একদিন উজ্জ্বল সাধুর নৌকায় এসে ওঠে। আবার আজ সে স্রোতে ভেসে যায়। বসন্ত জানেনা তার বন্ধু ফেলিপে আবার কোন হার্মাদের হাতে পড়বে কিনা।—এইভাবে প্রেমেন্দ্র মিত্র নতুন রূপকথায় মানবতার বীজ রোপন করেছেন। মঙ্গলবাণীর গান শুনিয়ে ছোটদের প্রাণে জাগিয়েছেন শুভ-সংবাদ।

বুদ্ধদেব প্রশ্ন তুলেছিলেন "তোমরা কী কেউ আমার এ বই পড়বে? বাজে কথা, কাজের কথা নয়। / বাজে কথা, মজার কথা / নয়কো, রাজা-প্রজার কথা, / স্বপ্নে শোনা আজগুবি সব গল্প-গুজব, / জলের কথা, হাওয়ার কথা,/ পরীর আসা-যাওয়ার কথা।"—

প্রশ্নের প্রথমাংশের উত্তর নিশ্চয়ার্থক। কিন্তু একথা স্বীকার্য, এখন আর কেবল ছেলে ভুলানো ছড়া নয়। শিশুর মন মাতানো আজগুবি কল্পনার খেলা ভেঙ্গে সমাজবোধে সচেতন হয়ে উঠেছে। রূপকথার মায়াটি রাখীর বন্ধন কেটে শিশুদের হাতে কর্তব্য ও দায়িত্ববোধের সম্মান এনে দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধদেবদের রচনা তাই দায়িত্ব অভিজ্ঞতা এবং বাস্তববোধে এঁদের রচনা চিহ্নিত। মানবতার জয়ধ্বনিতে তা জানালোকে প্রসারিত। সেই কল্লোলের স্রোত কালাবধি এগিয়ে গেছে।

৫। তবে একথাও ঠিক এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচিত বিষয় বৈশিষ্ট্য ব্যতীত ও আলোচ্য পর্বের শিশুসাহিত্যের আরো কিছু আছে। সেখানে রায়-পরিবারের রুচি ও আভিজাত্যে পূর্ণ লীলা মজুমদার এবং সত্যজিৎরা (পিসি ও ভাইপো) আছেন। আমরা পৃথক পরিবরে সত্যজিৎ সম্পর্কে আলোচনা করার অবকাশ আছে দেখে এখানে তার বিস্তৃত আলোচনা আর করছি না। কেবল আলোচনার সূত্র অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সত্যজিতের রচনা সম্পর্কে এটুকু বলা হচ্ছে যে তাঁর রচনার মূলত তিনটি শ্রেণী আছে: এক, ফেলুদা সিরিজের বই, দুই, প্রফেসর শঙ্কু সিরিজের রচনা, এবং তিন অন্যান্য। প্রথম ক্ষেত্রে বাদশাহী আংটি (১৯৬৯)। গ্যাংটকে গণ্ডগোল (১৯৭১), সোনার কেল্লা (১৯৭১) প্রভৃতি বই ধর্তব্য। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রফেসর শঙ্কু (১৯৭৫), প্রফেসর শঙ্কু ও বঙ্কু মহাসঙ্কটে শঙ্কু'র (১৯৭৭) মত গ্রন্থ এসে যায়। আর তৃতীয় শ্রেণীতে কিশোর উপন্যাস ফটিক চাঁদের (১৯৭৭) মত রচনা ধরতে হয়।

সত্যজিতের প্রথম গ্রন্থ বাদশাহী আংটি (১৯৬৯)। তাঁর গোয়েন্দা গল্পগুলি অধিকতর জনপ্রিয়। এবারকার (১৯৮৪) কলকাতার বই মেলা উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রশ্ন করে দেখা গেছে তাদের সবচেয়ে প্রিয় লেখক সত্যজিৎ। শঙ্কু সিরিজের কল্প-বিজ্ঞানমূলক রচনাগুলির যেমন তাঁর প্রফেসর শঙ্কুর রক্তমাংস রহস্য (১৯৭০) অথবা প্রফেসর শঙ্কুর ব্যোমযাত্রার ডাইরীতে (১৯৭৫) জুলভার্ণের 20,000 leagus under the sea (1870) অথবা Five Weeks in a Baloon (1863), এবং From the earth to the moon (1865) জাতীয় গ্রন্থের ছায়া লক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে সত্যজিৎ তাঁর পিতার নিকট কিছুটা ঋণী ছিলেন।—সাধারণ ভাবে দেখলে সত্যজিতের রচনায়, বিশেষতঃ তাঁর গোয়েন্দা গল্পগুলির পূর্বেকার গোয়েন্দা গল্প, অথবা রোমাঞ্চকর অভিযানের গল্প কাহিনী অপেক্ষা অনেক বেশি বুদ্ধি মনস্ক হয়ে উঠেছে দেখা যায়।

এখন আর কোন 'সুন্দর বাবু' ১২৫ মাইল বেগে ধাবমান কালো অ্যামবাসাডার কারের টায়ার লক্ষ্য করে কোমড়ের পিস্তল ছুঁড়ে গাড়ী থামিয়ে দেন না। এখন রহস্য সন্ধানের জন্য কার্যকারণ সম্পর্কের গ্রাহ্য স্বাভাবিকতা বজায় রাখা হয়। তবে শার্লকস হোমস কিম্বা পয়রটের মত পরাজিত গোয়েন্দার অপরাজেয় মহত্ব কেবল সত্যজিতের রচনায় কেন, বাংলা কোন ডিটেকটিভ গল্পেই এখনো রচিত হয়নি। কিন্তু ঘটনার বিন্যাসে, ভৌগোলিক সূত্র সংস্থাপনে, সত্যজিতের রচনায় যে বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য যুক্ত হয়েছে তা, এ যুগের গোয়েন্দা তথা অভিযান মূলক রচনায় নতুন বৈশিষ্ট্য রূপে গৃহীত হবে।

এ যুগের সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং প্রাচীন শিশুসাহিত্য রচয়িতা লীলা মজুমদার। সুকুমার রায়ের কাকা প্রমদারঞ্জনের কন্যা লীলা রায়ের স্বামী ছিলো সুধীরকুমার মজুমদার। ১৯২২-এ প্রথম সন্দেশ পত্রিকায় (১৯১৩) একটি গল্প লেখেন। লীলা মজুমদার মূলত কল্পবিজ্ঞানের গল্প ও কিশোর উপন্যাস লিখেই যশস্বী হয়েছেন। সম্প্রতি তিনি একটি কল্পবিজ্ঞানের গল্পের বইও (১৯৮৪) লিখেছেন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় শিশুসাহিত্য সম্পর্কে অনেক ভাবনা চিন্তাও করেছেন। উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার রায়ের উপর দু' খানি সুখপাঠ্য বইও লিখেছেন ; অনুবাদ করেছেন, Hans Anderson-এর রূপকথা ; লালবিহারী দের Folktales of Bengal আর Bengal Peasants' Life-এর ; লীলা বহু গল্প ও গ্রন্থের মধ্যে, পদীপিসির বর্মী বাক্স (১৯৫৩), গুপীর গুপ্তখাতা (১৯৫৯), মাকু (' ৬০ ?), নেপোর বই (১৯৫৯), টং লিং (১৯৬৩), লঙ্কা দাহন পালা (?), ঘোতন কোথায় (?) প্রভৃতি রচনা উল্লেখ করা গেল।

লীলা মজুমদারের রচনাগুলি ছোটদের ভাললাগার উপকরণে ভরা। সার্কাস, পুতুল, খাবার, পিকনিক, পশু-পাখী, আর সহস্র রঙের খেলা সেখানে এক আশ্চর্য মায়াময় জগৎ সৃষ্টি করেছে। তাঁর যে কোন রচনা, ধরা যাক রূপকথা আর কল্পবিজ্ঞানের মিশ্রণে গঠিত 'মাকু'র অংশ বিশেষ "সুন্দর লালচে কোঁকড়া চুল, ছাই রঙের চকচকে চোখ, নাকের ডগায় কালো তিল, গোলাপি ছাওাবিল সবুজ সামিয়ানা, একটা সবুজ আলো ছড়িয়ে আছে, কত রঙের ফুল। সেখানে দেখা যায় কালো ভালুক, রঙচঙে লাঠি, লাল আধখানা নীল আধখানা পোশাক পরা সত্যিকারের সঙ, ছোট ছোট হলুদ রঙের ফুল, লাল চোখ, সাদা ধবধবে মা-খরগোস, ফিকে বেগুনি প্রজাপতি…সবুজ মাজা, কালো বর্ডার আর …রামধনু রঙের চোখ বসানো।"

এ বর্ণাঢ্য ছবি অবনীন্দ্রনাথ স্মরণ করায়। কিন্তু কেবল রূপ নয়। রসের প্রগাঢ় অনুভূতিতেও লীলার রচনা শৈশবস্বর্গের সৃষ্টি করেছে। তিনিই প্রথম দেখালেন কাঁদলে পরে মাণিক ঝরে। হাসলে পরে হীরা। শিশুসাহিত্যের অন্যতম বড় উদ্দেশ্য 'মজা' সৃষ্টি। প্রধানত হাসিই তার উপকরণ। লীলাই প্রথম এই ধারণা ভেঙে কান্না দিয়ে মজা সৃষ্টি করলেন। উদাহরণ "ঘড়িআলা রেগে গেল। রাখ তোমাদের হাসি কান্নার কল…আর ফেরারি হয়ে ঘুরতে ভালো লাগে না। মার জন্য মন কেমন করে। অমনি টিয়া বলল, আমারও মা মনি, বাপি, আম্মা, ঠামু আর বোনের জন্যে মন কেমন করে। বলেই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে।" আবার দুপুরে বেশি ঘুমুলে সোনার মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। ঘুম ভাঙতেই টিয়াকে ঠেলে জাগিয়ে বলে—'মাকুকে চাই না। বিশ্রী মাকু। বলতে বলতেই থুথনিটা কাঁপতে লাগল। টিয়াও বল্লে—'দুষ্টু মাকু। খেলা দেখাবে না, লুচি বেলবে না, সাইকেল চালাবে না…

হারানো জিনিস খুঁজে নেবে না…মাকু ভাল না…বলতে বলতে দুজনার চোখ দিয়েই জল পড়ছে।

একালে শিশুসাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শব্দমুখরিত চঞ্চল জগতও লীলার হাতেই রচিত হয়েছে। সেখানে টিকটিকি, কাঠঠোকরা, কুকুর, ছুঁচো, ব্যাঙ, বেড়াল, সবুজ পায়রা, প্রজাপতি, মাকড়শা, বানর, বেজিরা অবিরাম কর্মতৎপর। শোনা যায় তাই পাতার আড়াল থেকে কাঠঠোকরার ঠন্‌ন্‌ন্, হুতোমথুম হুতোমথুম করে প্যাচার ডাক, বাঁধের উপর মালগাড়ির টং লিং টং লিং করে যাওয়া, খুন্তিটা ঝন্ ঝন্ করে মাটিতে পড়ে গেল, বৃষ্টি পড়তে লাগলো ঝুপ ঝুপ ঝন্‌ঝন্ করে পুরোনো বাড়ির ছাদে।

লীলা সাজিয়ে দিয়েছেন ছোটদের সামনে খিচুড়ি, কিশমিশ, পেস্তা, বাদাম, লুচি, চুইংগাম মোচা-চিংড়ি, দুধপুলি। অন্য দিকে ব্যবস্থা করেছেন গানবাজনারো—ট্যাম কুর কুর—ট্যাম কুর কুর ভ্যাঁপু ভ্যাঁপু ভোপর ভোঁ। কারণ? পরীরাণীর সঙ্গে বিয়ে হচ্ছিল তখন মাকুর। ('মাকু' একটি রোবট)।

রামায়ণের গল্পও নতুন করে রচনারও কৃতিত্ব লীলার কম ছিল না। অবশ্য রামায়ণ মহাভারতের গল্প কথায় মানবীয় গুণ আরোপ করে শিশুসাহিত্যে নতুনত্ব আরোপ করার প্রথম কৃতিত্ব উপেন্দ্রকিশোরের। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ইয়াঙ্কি পর্বের গল্পে তার চূড়ান্ত মজাসৃষ্টি করেছিলেন। সুকুমার রায়ও পিতৃঋণ স্বীকার করেছেন লক্ষ্মণের শক্তিশেলে। লীলা দেখিয়েছেন অশোক বনে চুপচাপ গাছে বসে হনুমান যখন বাদুরে বিস্কুট খাচ্ছিলেন তখন গাছের আড়াল থেকে ক্ষুদে রাক্ষস বেড়িয়ে এসে কেমন করে বলেছে—"উঁ হুঁ হুঁ। বেড়ে গন্ধটি তো, ও পিসে মশাই, আমাকে দাও।" হনুমান অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল "কেরে তুই? ভাগ বলছি। আমি তোর পিসে মশাই নই, তোর পিসে মশাই রাবণের বাড়ি গেছে · যা যা তুইও…যা।"

৬। আলোচ্য পর্বের শিশুসাহিত্যের অন্যতম আকর্ষণ দেখা দিয়েছিল চরিত্র সৃষ্টিতে। শিবরামের হর্ষবর্দ্ধন, নকুড়মামা, ইতু চরিত্রের কথা আমারা জানি। এ প্রসঙ্গে এও জানি যে শিবরাম মুখ্যত 'পান' দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করেছিলেন। সে রস কোথাও কোথাও শালীনতা লঙ্ঘিত। সে হাসি জোর করে তৈরী। কিন্তু এ যুগে এসব চরিত্রকেও ছাপিয়ে দেখা দিল 'দাদা' চরিত্র। যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা, নারায়ণ গাঙ্গুলির টেনিদা, বটুদা। 'দাদা' না হলেও দাদা-টাইপের চরিত্র সৌরীন্দ্রমোহনের চন্দরও।

বিশ শতকের এই দাদা চরিত্রের আবির্ভাব শিশুসাহিত্যের জগতের এক নতুন অভিজ্ঞতা। এই চরিত্রগুলিতে ছোটদের মনের পরিচয়ও যেমন পাওয়া যায়, তেমনি তাদেরই জীবনের পরিচিত বাস্তব অভিজ্ঞানও ফুটে ওঠে। যে মানসিকতায় শিশুকালে ছোটরা বড় হতে চায়, বড়দের মতো আচার আচরণ করে, সেই মানসিকতাকেই একজন অন্যদের উপরে কথায়, আচরণে এমন ভাব দেখায়, সেই সব দিক থেকে শ্রেষ্ঠ। সে জানে না এমন কিছু নেই, তার কাজেও সে এমনি এক অদ্বিতীয় ভাব বহাল রাখতে চেষ্টা করে। অন্যেরাও স্বভাবতঃই তাকে মেনে নেয়। কখনো বয়সের জন্যে, কখনো শারীরিক শক্তির জন্যে, আবার কখনো গল্প শোনার জন্যে। দলীয় নেতৃত্বের পদে সে আসন পেতে চায়। তাকে ঘিরে মজা উপভোগ করে অন্যেরা।—যে সমস্ত সুপ্ত বাসনা, আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন

ছোটরা দেখে, তা এই নেতার মধ্যে মুক্তি লাভ করে। যেমন দেশ বিদেশের বড় বড় ব্যক্তির সঙ্গ কামনা। বিশ্বের নামকরা জায়গা দেখা, বিবিধ বিষয় সম্পর্কে জানা—এসব সব শিশুরই কল্পনায় থাকে ; গল্পের মধ্যে সেই সুপ্ত মনের আদিম ইচ্ছা কাল্পনিক রূপে দেখা দেয়। তাকে বোধ হয় নিছক চালিয়াতি বলে অগ্রাহ্য করা যায় না। চন্দরের মতো ছেলের টু-লঙের মতো বার্মার যুবরাজের সঙ্গে পরিচয় থাকার কাল্পনিক গল্প সম্পূর্ণ মিথ্যাই ; এবং ঐ বয়সে সত্যি কোন কোন ছেলে ঐ রকম চাল দিয়াও থাকে ; ধরা পড়েও তাদের স্বভাব বদলায় না এও সত্য ; কিন্তু তার পিছনে আছে এক ধরণের শৈশব মানসিকতা। চন্দররা চিরকাল ধরে সকলের নিকট গুরুত্ব চায়। তার মনের অন্য দিকগুলি তথন জোরালো নয়। সে ভালো নয়, ফার্ষ্ট, সেকেণ্ড হয় না ; থেলাধুলায় পারদর্শী নয়, গানবাজনায়, চিত্র-বিদ্যায় দক্ষও নয়, সে সাধারণ। অথচ সকলের চোথে পড়তে চায়, সকলের উপরে নিজের কৃতিত্ব জাহির করতে চায়। তাই বানানো গল্পের থৈ ছড়িয়ে সে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিম্বা নেতা হয়ে, দল-সর্দার হয়ে সেই ইচ্ছা পূর্ণ করতে চায়। এমন চরিত্রের অভাবও নেই। তাদের নিয়ে গড়ে ওঠে ছোটদের অফুরন্ত কৌতুকময় উপভোগ্য জগৎ।

এই চরিত্রগুলি ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাদের এই ধরণের মানসিকতা গড়ে ওঠার পেছনে এক সামাজিক পরিবেশও কাজ করে। সুকুমার রায়ের হুলিরামের মামা ডেপুটি ছিলেন। স্কুলের কাছেই নিজেদের বাড়ি ছিল। সুতরাং তার আর্থিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছলই ছিল। অন্যদিকে শ্যামচাঁদও বড়লোকের বাড়ির ছেলে ছিল ; হাতে ঘড়ি পড়ে স্কুলে আসতো সে। অনুমান করা যায় এরা জীবনে বড়লোকের কায়দাকানুন গুলির সঙ্গে অপরিচিত ছিল না। স্কুলে এসেও সেই পরিমণ্ডলের চালিয়াতি তারা সহজেই করতো। বড় বড় লোকের সঙ্গে তাদের বাড়ির অভিভাবকদের পরিচয় থাকাও স্বাভাবিক ছিল, এরাও কল্পনায় ঐ রকম বড় বড় লোকেদের চিনতো আর তাই নিয়ে গল্প বানাতো। সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবেশেও তাই; তাদের স্বভাব বদলে গিয়েছিল।

অন্যদিকে চন্দর ছিল পশ্চিমে। থার্ড ক্লাসে উঠে কলকাতায় এলো পড়তে। কলকাতায় না পড়লে ভালো পড়াশুনো হয় না, এই মনে করে কলকাতায় সে তার মামার বাড়িতে এসে উঠেছিল। পশ্চিমের স্কুল ছেড়ে কলকাতায় স্কুলেই পড়াশুনোর জন্য সে আসে তারও আর্থিক অবস্থা থারাপ নয়। তাছাড়া তার পোশাক-আসাকেও যথেষ্ট সৌথিনতা ছিল। মামার বাড়ির আপ্যায়নও ছিল। সব মিলিয়ে পশ্চিমের থেকে এসে কলকাতার শহরে পরিবেশ, মোটামুটি বিত্ত স্বচ্ছল পরিবারে থেকে চন্দরও চালিয়াতিতে বেশ দ্রুত নাম করে ফেলেছিল।

এদের সঙ্গে বড় রকমের পার্থক্য ছিল 'টেনিদা'র। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই অমর সৃষ্টিটি নিতান্তই নাগরিক সভ্যতার ফসল। কলকাতার সংস্কৃতির পীঠস্থান রকের ছেলে। শিশুসাহিত্যে এই প্রথম রকের চরিত্রের গুরুত্ব দেওয়া হয়। 'টেনিদা'র কথাবার্তায়, আচার আচরণে যতটুকু বোঝা যায় সে মোটামুটি মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেল। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় অনেকবার সে হার্টফেল করেছে। আড্ডাবাজ। থেতে ভালবাসে, কিন্তু নিজে পয়সা থরচ করে থায় না। আইস ক্রিম আর তেলে ভাজাই বেশি থায়। বড় বড় হোটেল রেস্তোঁরায় যায় না ; ট্যাক্সি চেপে এদিক ওদিকও যায় না। কথনো কথনো থাণ্ডার ক্লাবের হয়ে মফঃস্বলে ফুটবল ম্যাচ থেলতে যায়। পটলডাঙার চাটুজ্যেদের রক,

সীতরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, শ্রদ্ধানন্দ পার্ক ওদিকে গড়ের মাঠে, অর্থাৎ প্রধানতঃ কলকাতাই হল তার বিচরণ-ভূমি। কথাবার্তায়, আচার আচরণে যথেষ্ট আভিজাত্য, রুচিশীলতা অপেক্ষা রক-সংস্কৃতির ছাপই স্পষ্ট। কলকাতার এই পরিবেশের প্রত্যাহিকতা সম্পূর্ণ বজায় রাথা হয়েছে এথানে। জামাকাপড়েও কোন বাবুগিরি তার নেই। পরের পয়সায় থাওয়া এবং সাধারণ জামাকাপড় ব্যবহারের কারণ সম্ভবতঃ টেনিদার অর্থনৈতিক অবস্থা। কিন্তু তার বাক্‌শক্তি ছিল আমেরি। যদিও লক্ষ্য করার বিষয় তাঁর গল্পের জগৎ গড়ে উঠেছিল সাধারণ বিষয় এবং পরিচিত লোক চরিত্র নিয়ে। চন্দরের মত কাঁইবিচির মধ্যে কাইজারের মুথ দেথার গল্প কিম্বা ঘনাদার মতো বিশ্বের মানচিত্র-চর্চিত বৈজ্ঞানিক কল্পনার বড় বড় কথা ও গণ্যমান্য লোকচরিত্র তার গল্পে স্থান পায়নি। বড়জোর কেওনঝরের জঙ্গলে সরকারী কণ্ট্রাক্টর আর হনুমান কিম্বা রেলের গার্ড অথবা টালিগঞ্জের ষ্টুডিওর গল্প আর বিহারী নাপিত ও পাড়ার কৃপণ ঘোড়ামামার গল্পেই সে সন্তুষ্ট থেকেছে। টেনিদার জগৎ সাধারণ মধ্যবিত্ত জগতের বস্তু ও মানুষ নিয়ে গড়ে উঠেছে। সেথানে বার্মার যুবরাজ কিম্বা হাটথোলার ও লক্ষ্ণৌ-এর নবাবের ভীড় নেই। এ জগতের সঙ্গেই ছোটদের প্রত্যক্ষ পরিচয়। আর ও-জগতের সঙ্গে শিশুর কল্পনার সেতু রচিত হয়। 'দাদা' জাতীয় চরিত্রের মধ্যে টেনিদার চরিত্র ও তার গল্প এই কারণে তাদের নিকট অধিকতর প্রিয়।

৭। এই প্রসঙ্গে স্কুল-বয়-ষ্টোরির একটা মোটিফ-ও এই পর্যায়ে দেথা যায়। এ বিষয়টির সূত্রপাত সুকুমার রায়ের হাতে। দাশু পাগলা, হুলিরাম প্রভৃতি চরিত্র নিয়ে রচিত স্কুল-জীবনের গল্পে দেথা গেছে একটি দুষ্টু ছেলের কাণ্ডকারথানা। যার অনুবর্তন লীলা রায়ের নটবরে। শীর্ষেন্দুর গোসাই বাগানের ভূতের বুরুণের ক্রিকেট থেলার মধ্যে। অবশ্য শীর্ষেন্দুর গল্পে স্কুল, স্কুলের থেলার মাঠ, থেলার মাষ্টার মশাই সব থাকলেও নিধিরাম নামক ভূতের বরই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এসব ক্ষেত্রে একটি ছেলের দুষ্টুমি অথবা চালয়াতির গল্পই প্রধান হয়ে ওঠে। তাতে ছেলেবেলার নির্দোষ আমেজটিই মুথ্য। কথনো সংস্কৃতের পণ্ডিত মশাইকে নিয়ে কথনো অঙ্কের মাষ্টার মশাই'র সঙ্গে, ছাত্রদের দুষ্টুমির কথায়, কথনো পাঠশালার শাস্তির কথায় এই গল্পগুলি জমে ওঠে। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণে এসে যায় বাদলার দিন সিড়ির নীচে ছোট বোনের সঙ্গে পুতুল থেলায় মগ্ন আশুর কপালে 'গিন্নি' নামকরণের লজ্জিত অনুভূতির কথা : কিংবা অপুর পাঠশালা-জীবনের ফিক্ করে হেসে ফেলে "এটা কি নাট্যশালা" শোনার আতঙ্কিত অভিজ্ঞতার কথা।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাতেও ছোট্টদের উপকরণের অভাব আদৌ ছিল না। সেথানে চোরবাগান টাইগার ক্লাবের সঙ্গে পটলডাঙার থাণ্ডার ক্লাবের ফুটবল ম্যাচে পটলডাঙার ব্যাক বল্টুদা সেম সাইডে গোল দিয়ে দেয় ; থবটা শুনে প্যালার মাথায় কটাঙ করে একটা গাট্টা মেরে নাকটা পাতিলেবুর মতো মুথটা ডিমের কারির মত করে টেনিদা বাঘাটে হুঙ্কার ছেড়ে বলে ওঠে—"একবার একাই আমি বত্রিশটা গোল দিয়েছিলুমরে একটা ম্যাচে।...থেলার মাঠে প্রবল বৃষ্টিপাত। শিবতলার পুকুর ভেসে মাছ উঠে এল...থেলোয়াড়, লাইন্সম্যান হাসি মুথে ঝাপিয়ে পড়লো মাছ ধরতে। রেফারি অবিচলিত থেকে অর্ডার দেন—"ইয়ু গো অন্ গোলিং, আই সে।" টেনিদা শুনে শুনে বত্রিশটা গোল দিতেই রেফারি বাঁশি বাজিয়ে থেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।"

এই সব খেলার মত উপকরণ নিয়েই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শহর আর গ্রাম শহরতলি আর অজ পাড়াগাঁর ভূগোলকে মিলিয়ে দেন অনায়াসে। জ্ঞান, আনন্দ, চরিত্রগঠন আর অবিমিশ্র মজার উপকরণে শিশুসাহিত্যের অভিজ্ঞানটি তার নখদর্পণে ছিল। তাই সহজেই দেখা যায় তাঁর টেনিদা বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডারের মত বুক ফুলিয়ে ফুলুরির দোকানের দিকে এগিয়ে যান বস্তুতঃ খেলা এযুগের শিশুসাহিত্যের একটি বিষয়-উপকরণ হয়ে উঠেছে। শীর্ষেন্দুর মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি (১৯৭৮)-তে ইণ্টার স্কুল ক্রিকেট ম্যাচ, "গোঁসাই বাগানের ভূত (১৯৭৯) বুরুণের ক্রিকেট খেলা ও স্কুলের অ্যানুয়াল স্পোর্টসের বর্ণনায় যেমন মজা আছে তেমনি আছে ছোটদের উত্তেজনার উপকরণ। হেমতগড়ের গুপ্তধনেও লাত্তেনপুর ভার্সেস হেতমগড়ের ফুটবল ম্যাচের কথা আছে।

খেলা অবশ্য নিছক খেলার উপকরণ হয়েই শীর্ষেন্দুর রচনায় আসেনি। খেলা উপলক্ষে শীর্ষেন্দু দেখিয়েছেন ছোটদের আত্মবিশ্বাসের কথা, চারিত্রিক দাঢ্য রচনার কথা। নিধিরাম ভূতের বরে বুরুণ খেলার মাঠে এবং পরীক্ষার খাতায় চাম্পিয়ান হলেও একদিন সে নিজ শক্তিতেই জিতে নিয়েছিল সাফল্যের বিজয়মালা। আবার মনোজদের অদ্ভুত বাড়িতে তিমির ও সমীর বিত্তের গৌরবে, শহুরে দেমাকে খেলার মাষ্টার মশাইকে অপমান করলে তার টিচার তারক গুহ ক্লাশ এইট থেকে মনোজকে বেছে ক্রিকেট তালিম দিয়ে পাকা খেলোয়াড়ে পরিণত করলেন একদিন ক্লাস নাইনের তিমির সমীররা মনোজের বেপরোয়া খেলার সামনে পরাজিত হয়ে মাথা নীচু করে চলে যায়। মনোজ তারকবাবুর সম্মান রক্ষা করে।

ঘটনা হিসাবে এ সবের মহত্ব অথবা গুরুত্ব তেমন নেই ; কিন্তু শিশুসাহিত্যের যে দায়িত্ববোধ তার পরিপ্রেক্ষিতে এসব গল্পের আবশ্যকতা আছে বৈকি ? তাছাড়াও এই সব অনুসঙ্গ ছোটদের অভিজ্ঞতার জগতের। তারা সহজেই আবিষ্কার করে নিতে পারে এদের মধ্যে নিজেদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে।

৮। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে একালে অনেক কিছু ভেঙ্গে অনেক কিছু নতুন গড়ে উঠেছে। যৌথ পরিবার ভেঙ্গে ছোট ছোট পরিবার হয়েছে পড়াশুনোর পাঠক্রমে বদল এসেছে। যাত্রা, থিয়েটার পুতুল নাচে পরিবর্তন এসেছে। এসেছে পোশাক-আশাকে পরিবর্তন ; বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে জীবন-যাত্রার সুবিধাজনক পরিবর্তন। ভাবনা চিন্তায় এসেছে পরিবর্তন। সমাজের দুঃস্থ দরিদ্রের জীবনেও এসেছে সচেতনতা। গ্রামাঞ্চলে, শহরতলিতে তার রেখা গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু যথেষ্ট জোরালো করে তার ছবি বিশেষ ফুটে ওঠে নি। দু একজনের রচনায় কিছুটা এসেছে।

যেমন মহাশ্বেতা দেবীর গল্পের গরু হ্যাদশ (১৯৮২)। বারোটি গল্পের এই সঙ্কলনে ভূমিদাস প্রথা নিবারণ ; ভূতের গল্প, জ্যান্তকালী, ভূতানন্দ কলোনী প্রভৃতি গল্পে উপজাতিদের সাহস, ত্যাগ, শ্রম ও বুদ্ধির শোষনে সুবিধাবাদী দালালদের অত্যাচার, সে অত্যাচারের প্রতিরোধের কাহিনী সাহসিক বলিষ্ঠতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু গল্পের রসবোধ ও তাৎপর্য যতটা বয়স্ক মনে ততটা শিশুবোধ্য নয়। বাস্তব রুঢ়তায় শিশুমন কিছুটা বিধ্বস্ত হতে বাধ্য।

অপর পক্ষে আংলা বাংলায় (১৯৮২) শান্ত লাহিড়ী তার কিশোর নায়ক সুমনের পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতার যে ছবি এঁকেছেন তাতে দেখা গেছে সেও শুনেছে বোমার শব্দ ; দেখেছে তার বন্ধু বদলে

যাচ্ছে, বাসস্থান ভাঙছে ; সেও প্রজাপতির ডানা ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছে জলে। কিন্তু আবার সেই জলেই ডুব দিচ্ছে সে। গায়ে তার প্রজাপতির ডানার রেণু লেগে যাচ্ছে। সে কেঁদে ওঠে। আর প্রজাপতি ধরতে চায়না সুমন। এ গল্পে একটি শুভ্র আলোর সংবাদ আছে। জীবনের একটি 'পসিটিভ্' দিকের উন্মোচন আছে। এযুগের শিশু সাহিত্যে এই অস্ত্যার্থক শুভবোধের ধারাটির মূল্য অবশ্যই স্বীকার্য।

শৈলেন ঘোষ, (১৯৩১) সুনীল গাঙ্গুলি, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ কালের তিন শিশু সাহিত্য রচয়িতা যাঁরা পশু পাখি নিয়ে গড়ে তুলেছেন শিশু সাহিত্যের আর একটি দিক। শৈলেন ঘোষ অবশ্য মূলত পুরাতন রূপকথার জগতে নিয়ে গিয়েছেন তাঁর বক্তব্য। যেমন ধরা যাক টোরা ও বাদশা (১৯৮২) বইটি। বাদশা ও টোরা সৎ ভাই বোন। অসাধারণ পোষা পাখীর বনে চলে যাওয়া আর তার জন্য সৎমায়ের প্রহারে সেই পাখীর ডাক শুনে রাতের অন্ধকারে দুই ভাই বোনের রূপকথার রাজ্যে গমন। দৈত্য দানো, জাদু প্রদীপের বর্ণাঢ্য বর্ণনার শেষে পাখির দর্শন কিন্তু সে আর তার বনের মা ছেড়ে টোরা বাদশাহের ঘরে আসে না। টোরা বাদশা ঘরে ফেরে। অন্যদিকে সুনীলের ডুংগা কুকুর পালিয়ে গেলে ডুংগার কিশোর অভিভাবক তার খোঁজে বেরুলে খারাপ লোকের হাতে পড়ে, তারপর একদিন বাড়ি ফিরে এসে দেখে ডুংগা ফিরে এসেছে অনেক আগেই। আবার গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার ববির বন্ধুতেও ছোট্ট মেয়ে মিনির সঙ্গে বনের ভালুক শাবক ববি'র বন্ধুত্বের বিয়োগান্ত গল্প শুনিয়েছেন। পশুপাখির সংগে মানুষের বিশেষ করে ছোটদের সংবেদনশীল মনের সম্পর্কটি একালে লেখক বিশেষ স্বতন্ত্ররূপে উপস্থিত করেছেন।

কখনো বাস্তব পটভূমিতে, গ্রামবাংলার দারিদ্র্য লাঞ্ছিত হিংস্র পশু-অধ্যুষিত অরণ্য জীবনের পরিচয় উদ্ঘাটনে (যেমন : শিবশঙ্কর মিত্র, সুন্দরবন, ১৯৮১), কখনো ছিন্নমূল উদ্বাস্তু কিশোরের মানসিকতায় রাজনৈতিক ঝড়ের দাপটে তার প্রকাশ (যেমন শান্ত লাহিড়ীর আংলা বাংলা, ৮২) আবার কখনো অরণ্য সৌন্দর্য রোমাঞ্চিত কিশোরের অভিজ্ঞতার কথায় (যেমন ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে, বুদ্ধদেব গুহ, ১৯৭৮) তার বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে।

আবার এরই পাশে পুরাতন কলকাতার চালচিত্র ধরে রেখেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী তাঁর ম্যাকের বাবা খ্যাঁকের অভিনব ছড়ায়।

হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া
মেলমালেকম টুক্কা দিয়া
চলছে সড়া
স্বপ্নে গড়া
বিগি বিত্তির
কালী মিত্তির
... ...
বাগ বাজারে
... ...
পাত সাজারে ॥ ইত্যাদি।

পুরানো ঐতিহ্য বজায় রেখে অমঙ্গল বোধ থেকে মঙ্গলালোকে উত্তরণও একালের শিশুসাহিত্যে দেখানো হয়েছে। যেমন কবিতা সিংহ'র চার পলাতকের কাহিনীতে নিতাই অমল প্রণব সুজয়রা গড়াগুনা ছেড়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু তারা ভাল কাজও করেছে। সিঠুয়াকে নিতাই সাপের কামড় থেকে বাঁচিয়েছে। তারা 'স্মাগ্লিং' কি জানতে চেয়েছে, ডাক্তারবাবু দেশের সোনার লক্ষ্মীমূর্তি চোরাই পথে কী ভাবে বিদেশে চালান হয়ে যায় তার উদাহরণ দিয়ে স্মাগ্লিং কী তার উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু তার পরেই তাদের বলেছেন, থাকগে, খারাপ লোকের কথা শুনতে নেই, ভাবতেও নেই তোরা উপরে তাকা। আকাশের তারাগুলো দেখ। আমার বন্ধু প্রেমেশ ছোটদের জন্য লেখে, সে বলে তাদের কাছ থেকে শিখতে হয়, ওরা সেই সত্যযুগ থেকে সমান উজ্জ্বল থেকে সমান আলো দিয়ে যাচ্ছে।"

সুখের কথা তাই এখনো তারাদের কথা নক্ষত্রদের জন্মের কথা লিখিত হয়। আমরা রূপকথার মত শুনতে পাই হারকিউলিস নক্ষত্র মণ্ডলের কথা, পারসিউসের কথা। সূর্যসমূহ ওসিরিসের কথা। আইসিস ও হোড়াসিস আলোর দেবতার কথা। অমানিশা কেটে যায় আলোর দেবতার স্পর্শে।

বিশশতকের প্রান্ত শেষে এসে যদি এই আশ্বাসটুকু কেউ দিতে পারেন তাহলেই সেখানে শিশু সাহিত্য রচনার চরিতার্থতা "অমনিশা কেটে যাবে আলোর স্পর্শে।"

গণিতের দর্পণে ঃ ভারতবর্ষ

মুরারি ঘোষ

গ্রীক দর্শনের সংগে ভারতীয় দর্শনের পার্থক্য এখানেই। গ্রীক দর্শন প্রথমেই চোখমেলে তাকিয়েছে পৃথিবীর দিকে। বাস্তব জীবনচর্চার মধ্যে আত্মসুখ, ব্যষ্টির সুখ অনুসন্ধান করেছে। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে, কি আস্তিক কি নাস্তিক (চার্বাকের ধারণা বাদে) চিন্তায় প্রথম উপলব্ধি— : জগৎ অনিত্য— জীবন দুঃখময়। ত্যাগ ও সংযমের পরীক্ষায় জীবন যাপনের কঠোরতা আনন্দময় বলে অনুভব করতে হবে। অল্পে সুখ নেই, ভূমায় সুখ। এই ভূমার ধারণাও বিচিত্র। বাস্তবে উপলব্ধ জগৎ ও জীবন এবং বস্তু-অস্তিত্বের অতীত অতীন্দ্রিয় সত্তার উপলব্ধি ভূমার অন্তর্গত।

ভূমার উপলব্ধিও ব্রহ্মজ্ঞানের বাস্তবতা ভারতীয় আস্তিক দর্শনের একমাত্র কথা, এ উপলব্ধি প্রাক-বৌদ্ধযুগে এক বিশেষ কষ্টসাধ্য পদ্ধতিতে যাগযজ্ঞ সম্পাদনেই নাকি লাভ করা সম্ভব ছিল। বৌদ্ধযুগে মোক্ষ লাভ আরো শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। সংসার ত্যাগে সংযমের চূড়ান্ত পরীক্ষায় মোক্ষলাভের যাথার্থ স্বীকৃত হোল। বৌদ্ধ-পরবর্তী যুগে আস্তিক চিন্তাধারায় আর এক সহজতর পন্থা আবিষ্কৃত হোল :— স্বধর্ম সাধনাই প্রকৃষ্ট ধর্ম। বলাহোল, গৃহীর গৃহ ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের রাজধর্ম, সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস বা স্ব স্ব আশ্রম বা বর্ণের অনুশীলিতব্য আচরণের যাথার্থ্যেই মোক্ষলাভ সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি : "ভারতবর্ষ জানিত ব্রহ্মলাভের দ্বারা মনুষ্যত্ব লাভই শিক্ষা। সেই শিক্ষা ব্যতীত গৃহস্থ তনয় গৃহী, রাজপুত্র রাজা হইতে পারিতনা। কারণ গৃহধর্মের মধ্যদিয়াই ব্রহ্মলাভ, রাজকর্মের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ভারতবর্ষের লক্ষ্য" (ধর্ম : রবীন্দ্রনাথ)। ফলে ধর্মের সংগে দর্শনের ও জীবন-যাত্রার এক সাধারণ সরলীকরণ সম্ভব হোল যা নাকি বৈদিক যুগে মোটেই সম্ভব ছিলনা।

দর্শনের সংগে ধর্মের অচ্ছেদ্য বন্ধন—এই হোল ভারতীয় মননের দান। যখনই ভারতীয় চিন্তায় আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনে বিরোধ বেঁধেছে তখনই ধর্মসাধনার আচার ও আচরণের প্রভেদ ঘটেছে কিন্তু দর্শনচর্চা বা ধর্মসাধনের স্থির লক্ষ্য অপরিবর্তিত থেকেছে। মুক্তিলাভের লক্ষ্য বিচ্যুত হয়নি কোনমতেই। হিন্দুচিন্তায় আগে ধর্ম, পরে দর্শন। ধর্মের অনুসরণ করেছে দর্শন। এখানে তাই দর্শনের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জিত। ধর্মের সংগে দর্শনের সম্পর্কে ধর্মের প্রাধান্য অনেককাল উচ্চকণ্ঠেই স্বীকার্য ছিল। এমনটি ঘটেছে মধ্যযুগের য়ুরোপেও। যেদিনের ধর্ম প্রবক্তরা বিজ্ঞানের আবিষ্কার দমনে কুণ্ঠিত হননি। য়ুরোপীয় বিজ্ঞানই প্রথম ধর্মবিরোধী সুর তুলেছিল। ধর্মের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা বিজ্ঞান চিন্তায় প্রকট হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় বিজ্ঞান কখনো ধর্মের প্রভুত্ব অস্বীকার করেনি। মৌলিক চর্চায় বিজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকলেও তা ভারতীয় চিন্তাকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করেনি। ভারতীয় বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা ও সিদ্ধান্ত কোন দার্শনিক প্রমাণ, প্রমেয় ও অনুমানের স্থিরতায় সন্দেহের রেখাপাত ঘটাতে পারে নি। গাণিতিক যুক্তির অবরোহী বৈচিত্র্য দার্শনিক বিচার পদ্ধতির রূপ নির্ণয়ে সামান্যতম উপযোগী হয়নি। ভারতীয় বিজ্ঞান চর্চায় এ অপূর্ণতা অস্বীকার করা যায় না।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, প্রাচীন হিন্দু চিন্তাধারায় বৈজ্ঞানিক মননের যথেষ্ট উদাহরণ রয়েছে। গ্রীক বিজ্ঞানের আগুষঙ্গিক বিকাশ ধারার সঙ্গে ভারতীয় বিজ্ঞানের চিন্তাধারা প্রায় সমান্তরালেই ছিল। জগৎ ও জীবন প্রবাহের ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে ভারতীয় দর্শনের প্রতিপাদ্য গড়ে তুলতে সরল যুক্তি প্রয়োগের পথ সুগম রাখতে হয়েছে। ভারতীয় মন যতই অতীন্দ্রিয় চিন্তায় নিমগ্ন থাকুক তবু অতীন্দ্রিয়ের স্বরূপ ব্যাখ্যায় বস্তু জগতের দিকে তার দৃষ্টি দান অবশ্যম্ভাবী ছিল। জাগতিক ইন্দ্রিয় পরায়ণতা যত স্থূলই হোক আসলে তা আমাদের সকল জ্ঞানের উৎস। ধর্মসাধনার সারবস্তু প্রকাশ করতে গিয়ে ভারতীয় দার্শনিক প্রজ্ঞার এই বস্তুজগতে আগমন ঘটেছে বারবার। এ আগমন তার বস্তুপ্রীতি বা Inference জাত জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার নয়। আসলে ভারতীয় দর্শনে মৌলস্বরূপ তা নয়। ধর্মের ভিত্তি দৃঢ়তর বনিয়াদে স্থাপন করার চেষ্টায় ভারতের দার্শনিক অনুসন্ধিৎসা। কেননা বিদ্যার শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান হল ব্রহ্মজ্ঞান। ভারতবর্ষে জ্ঞানের সমস্ত বিভাগেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা শেষ কথা। সব বিজ্ঞান চর্চাই কমবেশী করে ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

খৃষ্টীয় প্রথম শতকে সাংখ্য চিন্তা কেন্দ্র করে হিন্দু চিকিৎসা বিজ্ঞান ও পথ্য বিজ্ঞান গড়ে ওঠে। আয়ুর্বেদ তত্ত্ব জিজ্ঞাসায় ন্যায় ও বৈশেষিকের প্রভাবও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধ এবং জৈনরাও যৎকিঞ্চিৎ পরমাণবিক ধারণা গড়ে তুলেছিলেন। বিশেষ করে ন্যায় ও বৈশেষিকে এক সুচিন্তিত পরমাণবিক তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছিল। অবশ্য ডিমোক্রিটাসের তত্ত্ব জ্ঞানের সমপর্যায়ে তা উন্নত নয়। বৈশেষিক সূত্রের ভাষ্যে প্রশস্তপাদ কর্মের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মোটামুটি এক গতিবিজ্ঞান গড়ে তুলেছিলেন। গতি ও গতিবেগের কারণ ও বিভিন্ন দিক পরিবর্তনের (Kinetich) বর্ণনায় তাঁর তত্ত্ব সমৃদ্ধ ছিল। শব্দতত্ত্বের চর্চা করেছিলেন মীমাংসকেরা। বায়ু বাহিত হয়ে শব্দতরংগ শূন্যে ছড়িয়ে পড়ে এমন একটি সটিক ধারণাও তাঁরা দিয়েছিলেন।

বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্মোত্তর তাঁর 'ন্যায় বিন্দু টিকায়' বৃক্ষের জীবন, মৃত্যু, নিদ্রা এমন কি রোগের বর্ণনাও দিয়েছেন। জৈন লেখক গুণরত্ন বৃক্ষের জীবন, মৃত্যু ও বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষ আলোচনা করেছেন। আর চরক ও সুশ্রুতের আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানে বৃক্ষ জীবনের অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত। বৈদিক সাহিত্য ও বিভিন্ন পুরাণে বৃক্ষতত্ত্বের প্রচুর আলোচনা পাওয়া যাবে। বৈশেষিক ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ জন্মাহসারে বিভিন্ন জীবের যে শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন তার মৌল তত্ত্ব বর্তমান জীব-বিজ্ঞানেও সাদরে গৃহীত। যোগদর্শন রচয়িতা পতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে' জীব-জগতের এক স্থূল শ্রেণীবিভাগ দেওয়া আছে। আর এক অতি বিস্তৃত বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীবিভাগ পাওয়া যাবে জৈন চিকিৎসক উমাস্বাতির "তত্ত্বার্থাধিগম" সূত্রকে। শারীরবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যার উল্লেখযোগ্য চর্চা চরক ও সুশ্রুতে দ্রষ্টব্য।

অতি সামান্য এই তালিকা দিয়ে অতি বিস্তৃত বিজ্ঞান সম্পদের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। মোটামুটি প্রাচীন বিজ্ঞান সাধনার এই আভাষ ভারতীয় বিজ্ঞান বৈচিত্র্যের তথ্য উদ্ঘাটিত করবে। এত বিস্তৃত বিজ্ঞান আলোচনার সুযোগ প্রায় ভারতের প্রতিটি দর্শন-চিন্তায় সম্পৃক্ত হয়েছিল। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের সমবায়ে যে এই সমস্ত বিজ্ঞান আলোচনা গড়ে উঠেছিল তা অনস্বীকার্য—তবু এর নিজস্ব পরিবেশ যা নাকি একান্তভাবে ভারতীয় বিজ্ঞানের পরিবেশ তা নিয়ে আলোচনা দরকার।

বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ প্রণালীসিদ্ধ রীতি ভারতীয় বিজ্ঞান চিন্তায় প্রকাশ পেলেও তার পরিবেশ বৈচিত্র্যের প্রভাব থেকে বিজ্ঞানের মুক্তি ঘটে নি। বিজ্ঞান সম্মত সিদ্ধান্তের যে যুক্তিবাদ তার অভাব ছিল না ভারতীয় বিজ্ঞানে। ভূয়ো-দর্শনলব্ধ-জ্ঞান তত্ত্ববিচারে যে রীতিতে বৈজ্ঞানিক মননে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় বিজ্ঞান বিচার সেই বিশিষ্ট রীতি অনুসরণেই সার্থক হয়েছিল। গ্রীক গণিতে, বিশেষ করে জ্যামিতি চিন্তায় বিজ্ঞানের মৌলিকত্ব কতখানি রীতিসম্মত বলে মনে হয়, ভারতীয় বিজ্ঞানের বিশিষ্ট সাহিত্য সেই মৌলিকত্বেও নির্বিশেষ দাবী করতে পারে। অবশ্য ভারতীয় জ্যামিতি ও গ্রীক জ্যামিতির মধ্যে কোন তুলনাই হতে পারে না। তবু প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান সিদ্ধান্তের মৌলিকত্ব নিম্নোক্ত পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করেছেন :

প্রথম : প্রতিজ্ঞা ও প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু বর্ণনা।

দ্বিতীয় : যুক্তি সম্মত ব্যাখ্যাসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সংজ্ঞার্থ নির্ণয়।

তৃতীয় : পরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত বিচার।

বিস্তৃত আলোচনায় আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, যে সমগ্র বিজ্ঞান-চেতনা বিশেষভাবে যুক্তি-সিদ্ধ ও রীতিসম্মত।

শুধু তাই নয়, সমগ্র বিজ্ঞান সাহিত্য সম্ভার আয়তনে গ্রীক মনীষাকেও অতিক্রম করেছে। পাশ্চাত্যের অধুনা যে গর্ব, বিজ্ঞানের মনোপলি, একদা তাও ভারতের অধিকারে ছিল। অবশ্য বিজ্ঞান তথ্যের সংগে সংগে অনেক অবান্তর ধারণাও বিজ্ঞান বলে গৃহীত হয়েছিল। তবু ভারতীয় মৌল চিন্তা কাঠামোয় বিজ্ঞানের বিশেষ প্রকাশরীতি প্রাধান্য পেল না। যুক্তির কঠিন শিলারূপ দর্শন চিন্তায় গ্রাহ্য হোল না। প্রধান কারণ, বস্তুজগতের জ্ঞান ভারতবর্ষ কখনো চরম বলে মেনে নেয়নি। বস্তুর আপন অস্তিত্বের অতীত এক অনুপলব্ধ জ্ঞানের সন্ধানে ভারতবর্ষ সর্বদা তৎপর ছিল। বস্তুসত্তার অন্তরালবর্তী এই জ্ঞান প্রবাহের আলোচনায় বস্তুর বাহ্যরূপ যতখানি আলোচ্য ভারতবর্ষ তার বেশী এগোয়নি। কেন না ভারতের প্রতিটি দার্শনিক তত্ত্বেই স্বীকৃত যে পদার্থসমূহের জ্ঞান সকল জীবমুক্তির কারণ। এই জ্ঞান পদার্থের অতীন্দ্রিয় রূপের জ্ঞান। এই তত্ত্ব, এক চার্বক দর্শন ব্যতীত সমগ্র ভারতীয় দর্শন প্রজ্ঞার বিচার্য বিষয় এবং ধর্মসাধনার শেষ কথাও বটে।

পদার্থ জ্ঞানেই যে মুক্তি এমন একটি সিদ্ধান্ত কিন্তু জাগতিক যুক্তিসিদ্ধ নয়। তবু এই সিদ্ধান্তে সমস্ত দর্শন চর্চার নির্বিশেষ রায়দান বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আর এই তত্ত্ব সমগ্র দর্শন আলোচনার একমাত্র জন্ম উৎসের প্রতি আমাদের সচেতন করে তোলে। ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে সেই একমাত্র সত্যকথা যা বারবার উচ্চারিত হয়েছে তা হোল ভারতীয় দর্শন—(অবশ্য চার্বক দর্শন বাদে) সনাতন হিন্দুধর্মের বিস্তৃত ভাষ্যমূলক ব্যাখ্যা। আর প্রত্যেকটি দার্শনিক ব্যাখ্যার জনক হোল উপনিষদ। এই ভাষ্যমূলক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিভিন্ন দর্শন বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহণ করেছে। প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন পথে বিচরণ করেছে। আর প্রত্যেক দর্শনই স্বীয় অভিজ্ঞতায় চিন্তার সারবস্তু এবং ধর্মের শেষ কথা বলার দায়িত্ব নিয়েছে। প্রত্যেকেই নিজস্ব যুক্তির বৈচিত্র্যে সর্বজ্ঞতার ভূমিকায় আশ্চর্য তৃপ্তি বোধ করেছে। আস্তিক দর্শনের ছটা ভাগের মধ্যেই স্ব স্ব যুক্তির প্রাধান্য ও প্রামাণিকতা নিয়ে কলহের অন্ত নেই। একটিকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে হলে আর একটাকে বর্জন করতে হবেই। বিভিন্ন দার্শনিক সূত্রগ্রন্থ

প্রতিযোগী দর্শনের মত খণ্ডন করেছে। শুধু মতবাদগত বা পূর্বগত খণ্ডন প্রায়াস নয়, মাঝে মাঝে এই বিভেদ ও বিরোধী যুক্তি প্রয়োগ এমন মারাত্মক হয়ে ওঠে যে মুখোমুখি তর্কের আসরে দুই বিতর্কমান পক্ষের শেষ মীমাংসা ঘটে অগ্নি পরীক্ষায়। পুরাণে দার্শনিক তর্কযুদ্ধের এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে একপক্ষের জয়সূচিত হয়েছে অপর পক্ষের নিশ্চিত মৃত্যুর দুর্ঘটনায়।

মীমাংসা যেখানে তর্কপ্রয়োগে বা যুযুক্তি প্রয়োগে সম্ভব হয় না, অস্ত্রই সেখানে শেষ যুক্তি। কিন্তু অস্ত্রের এই যুক্তি কদাচই গ্রীক দর্শন-সংগ্রামে ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে সময়ে সময়ে মতভেদ ও কলহ যথেষ্ট তীব্র হলেও (যেমন ডিমোক্রিটাসের বিরুদ্ধে প্লেটোর যুক্তি প্রয়োগ) দৈহিক বলপ্রয়োগ বোধহয় কখনোই হয়নি। সক্রেটিসের মৃত্যু নিশ্চয়ই দার্শনিক কলহের পরিণতি নয়। গ্রীক দর্শনে যে মতভেদ ছড়িয়ে আছে, তা বিভিন্ন অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তির ওপর ভিন্ন ভিন্ন যুক্তির প্রয়োগ। কিন্তু গ্রীক দার্শনিক প্রজ্ঞা কখনোই এক লক্ষ্যবস্তুর দিকে পরিচালিত হয়নি। বিভিন্ন লক্ষ্য অভিমুখে তাকে নিয়তই পথ পরিবর্তন করতে হয়েছে। আর বিভিন্ন জাগতিক বিষয়বস্তু নিয়েই তার আলোচ্য সত্তার জাগতিক যুক্তি প্রয়োগ সুনিপুণ হয়ে উঠেছে। ঠিক এই ধারায় ভারতীয় দর্শন অগ্রসর হতে পারে নি। ধর্মের পিতৃউৎস হতে তার জন্ম হবার পর কখনোই সে পিতৃঋণ অস্বীকার করে বসেনি। তাই ধর্ম আচরণ ও ধর্মতত্ত্ব ছাড়া তার অন্য লক্ষ্যবস্তু ছিল না। বিজ্ঞানের গতিপথ ধর্মের অভীপ্সা দর্শন নিয়ন্ত্রণ করেছে। দার্শনিক সত্য উপলব্ধির খাতিরেই কিছু কিছু জাগতিক তত্ত্ব বিচারের নিষ্ঠায় তার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু বিজ্ঞান-নিষ্ঠ যুক্তি-প্রবাহে ষড় দর্শনের কোন আসক্তি ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। বিজ্ঞানের কাছ থেকে তার যুক্তিবাদ কোন ভারতীয় দর্শন গ্রহণ করেনি। গ্রহণ করেনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার সহজ সরল যুক্তিগুলিও। ফলে অনেক অনর্থক যুক্তি প্রয়োগে বিভিন্ন দর্শন আয়তনে ভারী হয়েছে—আর অনেক বস্তু ধারণা অগুচ্ছ রয়ে গেছে। এমন উদাহরণ ষড় দর্শনের একাধিক সূত্রব্যাখ্যা থেকে তুলে দেওয়া যায়। এমন কি অনুপম তর্কশাস্ত্র ন্যায়দর্শন থেকেও এই অনুদার যুক্তিহীনতা তুলে ধরা যায়।

পর্বতে ধুম আছে : ন্যায়ের এই বিখ্যাত পঞ্চাবয়ব আনুমানিক সিদ্ধান্তের যুক্তি প্রয়োগ লক্ষ্য করলে তা পরিষ্কার হবে। যথা :

১. পর্বতে আগুন আছে।
২. যেহেতু সেখানে ধুম দেখা যায়।
৩. কেননা ধুম দেখা যায় যেখানে, সেখানেই আগুন থাকে।
৪. পর্বতে ধুম দেখা যায়।
৫. অতএব পর্বতে আগুন আছে, ইহাই সিদ্ধান্ত।

কিন্তু নির্বিশেষ তর্কবিচারে কোন সিদ্ধান্ত এখানে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ধুম-সম্পর্কিত বস্তুজ্ঞান যখন স্পষ্ট নয়—ধুমের নানান প্রকারভেদ ও উপাদান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানে যখন সম্পূর্ণ গৃহীত নয় তখন তার উৎপত্তির বিভিন্ন কারণ বাস্তব অভিজ্ঞতায় প্রতিফলিত হবে না। আগুন ছাড়াও ধুমের যথেষ্ট উদাহরণ রয়েছে, এ তো হল নিছক অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান।—এবং ব্যাপক বস্তুবিচারের ফল। কেবল পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্তের প্রয়োজনে অসমাপ্ত বস্তুবিচার দিয়ে সিদ্ধান্তে পূর্ণচ্ছেদ টানার অধৈর্যে

সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। অসমাপ্ত যুক্তি প্রয়োগে ধ্রুব যুক্তি নিষ্ঠারও ব্যাঘাত ঘটে। ভারতীয় দর্শন-রাজ্যে এরকম অসমাপ্ত যুক্তি প্রয়োগ অজস্র তুলে ধরা চলে। শুনলে হয়তো আশ্চর্য হতে হবে যে এর একমাত্র কারণ হোল বিজ্ঞান চর্চায় ধর্মীয় পরিবেশ। এই পরিবেশ থেকে প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না। তাই স্থানে স্থানে বৈজ্ঞানিক মননশীলতার ও জাগতিক বস্তু চর্চার চমক দেখা গেলেও তা অবশেষে ধর্মের একাধিপত্যে অগ্রসর হবার উদ্দীপনা পায়নি। এই পরিবেশ বৈচিত্র্যের প্রভাব ভারতীয় বিজ্ঞান চর্চার প্রধানতম কথা।

আর এক প্রসঙ্গও এখানে আলোচ্য, তা হোল ভারতীয় দর্শনের মৌলরূপ। একাধিকবার যা বলা হয়েছে। ধর্মের পিতৃত্ব হতে তার আবির্ভাব বলে ভারতীয় ধর্মের যা নিগূঢ় উপলব্ধি ভারতীয় দর্শনের প্রতিপাদ্য বিচারও তাই। ভারতীয় দর্শনে আধ্যাত্মিক মোক্ষ লাভের শ্রেষ্ঠত্ব অজস্র ভংগিতে ও তথ্যসম্ভারে আলোচিত হয়েছে। গ্রীক দর্শনে আলোচ্য ছিল, সৌন্দর্যতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র, যুক্তিশাস্ত্র, রাজনীতি ও ধর্মতত্ত্ব। এত ব্যাপক বিষয়বস্তুতে ভারতীয় দর্শন সম্প্রসারিত হয়নি। রাষ্ট্র, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্যতাই ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য। দুঃখময় পৃথিবীতে জীবনযাপন করাই দুঃখ—যদিও জীবনযাপন আনন্দময় উপলব্ধি বলে মেনে নিতে—কিন্তু জীবন থেকে মুক্তিই প্রধানতম কাম্য (জীবন বন্ধনমাত্র—জীবন্মুক্তি শ্রেয়স্)। ভারতীয় দর্শন তাই বিপুল এক মোক্ষ শাস্ত্ররূপে প্রকাশিত।

মোক্ষ শাস্ত্ররূপে দর্শনের এই যে মৌল রূপ, তা হোল ব্যক্তির মোক্ষ, সমাজের নয়। ব্যষ্টির মোক্ষ, সমষ্টির নয়। ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধারণায় ভারতীয় ধর্ম সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে—ধর্মগত বন্ধনে হয়তো বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় সমাজ সৃষ্টি করেছে—তবু সনাতন ধর্মের আধ্যাত্মিকতা একান্তরূপেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আত্মকেন্দ্রিক। আর এই আড়াই হাজার বছরের আত্ম-কেন্দ্রিক মোক্ষ শাস্ত্র আমাদের আজো জাগতিক জীবনে কর্মতৎপর করে তোলেনি। সামগ্রিক জীবন-প্রবাহে তৎপরতা ও উদ্দীপনার অভাব এখনো মর্মে মর্মে আমরা অনুভব করি। সমষ্টির চিন্তায় বা সামগ্রিক জীবন বৈচিত্র্যের সন্ধানে আমাদের অশেষ শৈথিল্য—এবং মাঝে মাঝে এই শৈথিল্যের দার্শনিকতায় আমাদের ঐতিহ্যগর্বী মনও বিশেষ সান্ত্বনা পায়। আমাদের আতিগত এই বৈশিষ্ট্য, আমাদের ধর্মের ও দর্শনের চরিত্ররূপ। অবশ্য ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সাধনায় আমরা মুক্তির সত্যে গিয়ে পৌঁছেছি—এই হোল শাস্ত্র স্বীকৃত তত্ত্ব। কিন্তু মুক্তির সত্যে জোর পড়ায় সামাজিক জীবনাদর্শ ভারতীয় চিন্তায় অনেকখানি খাটো হয়ে গেছে।

জগৎ ও জীবনকে অগ্রাহ্য করার মত তুচ্ছতা নেই বলেই গ্রীক দর্শন রাষ্ট্র চিন্তা, সৌন্দর্যদর্শন, নীতিশাস্ত্র—এসবের ওপরে জোর দিয়েছে। পার্থিব সমস্ত অভিজ্ঞতার ও বস্তুজ্ঞানের সকল তত্ত্ব উদ্ঘাটনে সাহায্য করবে, এমন প্রত্যাশা দর্শনের কাছে অন্যায় নয়। পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান ও বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সমন্বিত ও সংহত করাই দর্শনের অভিপ্রেত। এই হোল দার্শনিক 'র‍্যাশানালাইজেসন' বা যুক্তিবাদ। ধর্মের স্বরূপ সমর্থনে বা মহত্ত্ব উদ্ঘাটনে জাগতিক জ্ঞানের ব্যাখ্যা যতটুকু প্রয়োজন ভারতীয় দর্শন সেই তত্ত্ব রচনায় ও তথ্য উদ্ঘাটনে কার্পণ্য করেনি। এবং ধর্মের একাধিপত্যেই ভারতীয় বিজ্ঞান আলোচনা যে বিষয়-গুরুত্বে সংহত হয়েছে তাও প্রণিধানযোগ্য।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন :

Hindu philosopy on its empirical side was dominated by concepts derived from physiollogy and philology, just as Greek philosophy was similarly dominated by geometrical concepts and methods. The Positive Science of the Hindus/ : B. N. Seal.

ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে এই কথাগুলি ভারতীয় দর্শনের চরিত্র উদ্ঘাটিত করেছে। দেহ ও মনের মুক্তি সন্ধানে এবং একান্ত ব্যক্তি কেন্দ্রিক সাধনায় বিজ্ঞানের যে দিকটি ভারতীয় দর্শন জগৎ উজ্জ্বল করে তুলেছে তা হোল শারীর বিদ্যা। দার্শনিক অভিজ্ঞতায় শারীরবিদ্যা নিঃসন্দেহে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের চর্চা, নিজেকে হাজার অর্থে, দেহ ও আমার স্বরূপ সন্ধানে ভারত দর্শনের অপরিসীম নিষ্ঠা। শরীর রক্ষণার্থে প্রাণায়াম ও যৌগিক ক্রিয়া কিংবা এক পরিণত চিকিৎসা বিজ্ঞান ভারতীয় দর্শনের অতুলনীয় ঐশ্বর্য। এই প্রসঙ্গে গ্রীসের সংগে তুলনায় আচার্য শীল জ্যামিতির কথাও তুলেছেন। জ্যামিতির যুক্তিবাদে প্রখরতর গ্রীক দর্শন এবং বিষয়-গুরুত্বে উজ্জ্বল গ্রীসীয় বুদ্ধিবাদ। সাধারণতঃ গণিতের অসীম প্রভাব দর্শনের স্বরূপ ব্যাখ্যা। অথচ উচ্চতর গণিতের চর্চায় ভারতীয় মননশীলতা যখন পশ্চাদ্‌গামী নয় তখন গাণিতিক বুদ্ধিবাদে ভারতের দর্শন উজ্জ্বলতর হোল না কেন? এই প্রশ্নের জবাব ভারতীয় দর্শনের সেই এক বিষয়-ঐতিহ্যে সেই ধর্মগত মুক্তিলাভের এষণায়: কোন ধর্মের ধ্রুবসিদ্ধান্তের পিছুটান কোনমতেই গাণিতিক যুক্তি সিদ্ধ নয়। গণিত যে ধ্রুবতার সন্ধান দেয় যুক্তি প্রয়োগের অবরোহ ছাড়া তার উপলব্ধি অসম্ভব। ধর্মসাধনায় উপলব্ধ জ্ঞানের ভাবমূলক ব্যাখ্যায় ভারতীয় দর্শন সংহত। গণিতে নিছক উপলব্ধি বলে কিছু নেই। তার সকল সিদ্ধান্ত বা ধারণা যুক্তি সিদ্ধপথে প্রতিষ্ঠিত।

সভ্যতার দর্পণ বলে গণিতকে যে আখ্যা দেওয়া হয় ভারতীয় গণিতে সে সভ্যতার ছবি নিশ্চয়ই প্রতিফলিত। কেননা ভারতীয় দর্শনে যে সমাজ ও সভ্যতার ছবি পরিস্ফুট তাতে ভারতীয় গণিতের প্রভাব স্বল্পতম বললে কুণ্ঠার কিছু নেই। গণিতের যুক্তিবাদ ভারতীয় দর্শন গ্রহণ করেনি। এর অন্য কারণও হবে ভারতীয় গণিতের বিষয়-ঐতিহ্য। ভারতীয় গণিতের শ্রেষ্ঠ বিকাশ বীজগণিতে। বীজগণিতের প্রতীকময়তা যথাযথ যুক্তি নিষ্ঠার সংগে যুক্তির অতীত এক অতীন্দ্রিয় মননে আকর্ষণ করে। প্রতীকের ধর্মই হোল কল্পনার পক্ষ বিস্তারে সহায়ক হওয়া। কিন্তু ঐ কল্পনা কোন উদ্দেশ্যহীন গগন-বিহার নয়। সূক্ষ্মতর ভাবরূপে সংহত হবার পথনির্দেশ। অবশ্য গাণিতিক প্রতীকের সংগে গণিত তত্ত্বের অতীত কোন কল্পনার সম্পর্ক সম্ভব নয়—তবু স্বাভাবিক ভাবে সকল প্রতীকের যা সাধারণ ধর্ম চিন্তার কেন্দ্রানুগ পক্ষ বিস্তার, তা গণিতে না হোক অপর কোন বিষয় বস্তুগত মননে নিশ্চয়ই বিস্তার করবে।

আমাদের ধর্মচিন্তায় আমাদের ভাবরূপ সংহত হয়েছে সেই একক ব্রহ্মে। এমন কি সকল সত্তা বিলীন হয়ে আছে সেই ব্রহ্মে। ব্রহ্মের রূপকল্পনা অসংখ্য প্রতীকে সাধকদের কাছে উজ্জ্বল। বীজগণিতকে বলা হয়েছে অব্যক্ত গণিত। অর্থাৎ প্রতীকের অব্যক্ত ব্যঞ্জনায় গণিতের তত্ত্ব সংহত। এই জ্ঞানের দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য্যের—উক্তি উল্লেখ্য—বীজগণিতের প্রসঙ্গেই তাঁর এই উক্তি। প্রশ্ন ছিল,

'বিশুদ্ধ জ্ঞান বা বুদ্ধিমতেই যখন অব্যক্ত সমস্ত তত্ত্ব ব্যক্ত হয়—তখন বীজ বা প্রতীকের কী প্রয়োজন?' (বীজাকারে রূপকল্পনাই হল প্রতীক-বীজের মধ্যে আসল সত্তার সমগ্র রূপই সংহত।) ভাস্করাচার্য্যের উত্তর ছিল, 'বিশুদ্ধ বোদ্ধাই শেষ বিশ্লেষণে পারঙ্গম, প্রতীকেরা কেবল এই সহায়ক (বীজগণিত—ভাস্করাচার্য)। এই সূত্রে নিশ্চয়ই স্মরণীয় বিশুদ্ধ দর্শনের তত্ত্ব: "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা," কিংবা গণিতজ্ঞ নারায়নাচার্য্য যখন বলেন, 'আমি অব্যক্ত গণিতের সংগে ব্রহ্মকে প্রণতি জানাই। ব্রহ্ম যেমন বহুগুণ সমন্বিত জগতের আদি কারণ, অব্যক্ত গণিত ও তেমনি ব্যক্ত গণিতের সকল সূত্ররাজির কারণ" (বীজগণিত: নারায়ণাচার্য্য)।

ব্রহ্মার সংগে গণিততত্ত্বের এই সরলীকরণ আধুনিক গণিতের কাছে এক নিরর্থক কল্পনা কিন্তু এ কল্পনা গভীর অর্থবহ ছিল ভারতীয় গণিতবেত্তাদের কাছে। দর্শনের সংগে গণিতের যে সম্পর্ক সে সম্পর্কের সূত্রে এসেছে ধর্মের অভিভাবকত্বে। ধর্মসাধনার ক্রিয়ামূলক আচরণের ভাবগত ব্যাখ্যা জুগিয়েছে দর্শন—এবং যথাযথভাবে সকল কাজ সম্পূর্ণ করার বাস্তব জ্ঞানের প্রয়োজন উদ্ভব হয়েছে গণিতের। সময় গণনা থেকে জ্যোতির্বিদ্যা—বীজাকারে গণনা থেকে বীজগণিত। বীজগণিতের তত্ত্ব ও তথ্য তাই ভারতীয় মনীষায় বিস্তৃত রূপ লাভ করেছে। বীজগণিতের দর্শনেই ভারতীয় মনন সম্পূর্ণ প্রতিফলিত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রমণী-সমাজ

রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রাধাকৃষ্ণের এক লৌকিক প্রেমগাথা। সম্পূর্ণ পদকীর্তনের আকারে লেখা এই নাট্যগীতি কাব্যটি বাংলাসাহিত্যের একটি সুপ্রাচীন নিদর্শন। কয়েকজন ভাষাচার্য ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' মোটামুটি চতুর্দশ শতকের রচনা বলে অনুমিত। ভাষার দিক থেকে বিচার করলে রচনাটি বাংলার দ্বিতীয় গ্রন্থ। 'চর্যাপদের' পরই এর স্থান। কাব্যটির রচনাকার, বড়ু চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ প্রাক চৈতন্য যুগের কোন এক সময়ে অবিভূর্ত হয়েছিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কবির এক অক্ষয় কীর্তি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রমণী সমাজের চিত্রগুলি স্বল্পাকারে বিধৃত হলেও, অস্পষ্ট নয়। চিত্রগুলি অধিকাংশই শ্রমিক সমাজের। পুরুষদের মত রমণীরাও এখানে শ্রমজীবী। কাব্যে কয়েকটি বৃত্তিগত জাতির উল্লেখ আছে। বৃত্তি অনুযায়ী কাজ করে লোকেরা তখন জীবিকা নির্বাহ করত। জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে পুরুষ বা রমণী কেউ নিজেদের বৃত্তি পরিত্যাগ করত না। এমন কি অবস্থা সঙ্গতিপন্ন হলেও নিজ বৃত্তিকে কখনও অমর্যাদা করত না। বোধ হয়, এটাই ছিল সেযুগের সামাজিক রীতি। কৃষ্ণকীর্তনে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাধা বিত্তবান অভিমন্যুর পত্নী হয়েও আর সকল গোপ-রমণীদের মতই দুধ দইয়ের পসরা নিয়ে মথুরার হাটে চলেছেন :

(ক) 'দধি দুধে সসার সজাআঁ।
নেত বাসে হাড়ন দিয়াঁ॥ ল রাধা
সব সখিজন খেলি রঙ্গে।
একচিত্তে বড়ায়ির সঙ্গে॥ ল রাধা' [পৃঃ ৪]

(খ) 'ঘৃত দধি দুধ আওর ঘোল
এ সব মোর পসরা।'...... [পৃঃ ১৪]

বান্ধবী ছাড়া রাধার সঙ্গে রয়েছে বড়ায়ি। বড়ায়ি রাধার সমপর্যায়ভুক্ত সখী নয়, —রাধার তত্ত্বাবধায়িকা এক বৃদ্ধা ; সম্পর্কে মাতার পিসি।

সেযুগে সুন্দরী নবযৌবনা রমণীদের কোথাও যেতে হলে, এমনি একজন অতি বয়স্কা আত্মীয়া বা পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে তারা বেরুত। একা বা সমবয়স্কাদের সঙ্গে পথ চলা নিরাপদ ছিল না। একদিন পথিমধ্যে রাধাকে হারিয়ে বড়ায়ি তাঁর খোঁজে চারদিকে বিচরণ করতে লাগল :

'রাধিকা হারাআঁ বড়ায়ি বুলে থানে থানে।
ভাল মনে পথক না দেখে নয়নে॥' [পৃঃ ৪]

বড়ায়ির মত অতি বয়স্কা মহিলারা সময় বিশেষে আবার কামশাস্ত্রোক্ত আদর্শে দূতীর কাজ করত। তারও নজীর রয়েছে কৃষ্ণকীর্তনে।

গোকুল হতে মথুরা অনেকখানি পথ। তাও আবার বনপথ। বন বলতে বৃন্দাবন। গোপীরা

এই পথ ধরে নিত্য মথুরার হাটে যেত দুধ, দই ইত্যাদি বিক্রি করতে। আবার নদীপথেও মথুরার হাটে যাওয়া সম্ভব ছিল। নদী বলতে যমুনা। যমুনার একপ্রান্তে মথুরা ; সবার প্রান্তে গোকুল বৃন্দাবন। কৃষ্ণকীর্তনে এর বর্ণনা পাওয়া যায় :

(ক) 'শরত সমএ রৌদ সহিতেঁ না পারী।
এভোঁ বড় দূর আছে মথুরা নগরী॥' [পৃঃ ৬৭]

(খ) 'ঘৃতে দুধে সজাআঁ পসার।
বিকি জাইএ যমুনার পার॥' [পৃঃ ২৫]

[গ] 'ওকুলে মথুরা মাঝে যমুনার নদী।' [পৃঃ ৫৯]

গোপ রমণীরা মথুরায় চুপড়ী নিয়ে নিত্য হাটে যেত। চুপড়ীতে থাকত দুধ দুধের সম্ভার। চুপড়ীগুলো সাধারণতঃ বাঁশের তৈরী। কতক চুপড়ী আবার দড়ির :

'ঘাটের ঘাটি অলে কহি গেল সে।
দড়ির চুপড়ী মোর পার করি দে॥ [পৃঃ ৫৭]

অবশ্য কাব্যে সোনার চুপড়ী এবং রূপার ঘড়ী বা ঘটের কথা পাওয়া যায়। রাধার মাথায় থাকত সোনার চুপড়ী এবং রূপার ঘট :

'সোনার চুপড়ী রাধা রূপার ঘড়ী।
নেতের আঞ্চল তাত দিআঁ ওহাড়ী॥' [পৃঃ ৫৬]

উপরিউক্ত বর্ণনাটিতে কবির অতিশয়োক্তি প্রকাশ পেয়েচে। অবশ্য তিনি এখানে পারিবারিক স্বচ্ছলতার কথাই বলতে চেয়েছেন। রাধা সঙ্গতিপন্ন আইহনের বা অভিমন্যুর ঘরণী। সাধারণ গোপ রমণীদের তুলনায় তাঁর পারিবারিক অবস্থা যথেষ্ট স্বচ্ছল। পক্ষান্তরে সাধারণ গোপীদের মাথায় থাকত দড়ি বা বাঁশের চুপড়ী। সেখানে দৈন্য ও অনটনের চিত্র,—গ্রাম্যতার নিদর্শন।

যাতায়াতের পথঘাট তেমন নিরাপদ ছিল না। পথে বাটোয়ারের (বাটপাড়) ভয় ছিল। সুযোগ পেলে তারা পথে বিপথে লোকের সর্বস্ব হরণ করত।

শ্রমজীবী রমণীরা পণ্য দ্রব্যের পসরা নিয়ে বাড়ি থেকে ভোরবেলায় রওনা হত। হাটের বেচা-কেনা পর্ব মধ্যাহ্নের আগেই শেষ হত। রমণীরা কাজ শেষ করে এই সময় যে যার ঘরে ফিরে আসত। বাড়ি ফিরে তারা স্বামী ও সন্তানের পরিচর্যায় নিযুক্ত হত। হাট থেকে কোন সময় ফিরতে দেরী হলে আত্মীয়-স্বজনের গঞ্জনা শুনতে হত।

'সাত ঘটি গেল হএ দুঅজ পহর।
গোঠে হৈতেঁ আসিবে গোআল মোর ঘর॥
ঘরে না দেখিআঁ বড় খঙ্গায়িবে মোরে।
দয়া ধরম কিনা বসে তোম্বারে॥ [পৃঃ ৬৩]
[সাত ঘটি সময় অর্থে প্রায় পনর দণ্ড অর্থাৎ দ্বিপ্রহর]

তৎকালীন গ্রাম্য সমাজের রমণীরা পথে বিপথে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ ছিল। বিপদে পড়লে শক্তির পরিচয় দিত। তারা অবলা ছিলনা। কোন পুরুষের অশোভন আচরণ লক্ষ্য করলে তাকে

অপমান, তিরস্কার এবং লাঞ্ছিত করতে কসুর করতনা। এমনকি প্রয়োজন বোধে সেই অপরাধী ব্যক্তিকে কিলাতে বা ধরে বেঁধে আনতে ভয় পেতনা। এই প্রসঙ্গে বড়ায়ি এবং রাধার দু'টি উক্তি স্মর্তব্য :

ক) 'মাগুকিলে মারো আজি যবে কর বল।' (পৃঃ ৪৮)
['মাগুকিলে' অর্থে স্ত্রীলোকের মুষ্টিপ্রহার]

খ) 'ভারসম কর দধি যেহ্ন নাহিঁ টলে।
দধি নঠ হৈলেঁ মারিব মাগুকিলে ॥' [পৃঃ ৭০]

রমণীদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, কলহ, অশোভন উক্তি এবং প্রহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'। একটি অন্যায় প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রাধা বয়স্কা বড়ায়িকে কটূক্তি সহ নিদারুণ অপমান করেছেন :

ক) 'দারুণী বুঢ়ী তোর বাণেত নাহিঁ লাজ।
তেকারণে মোক বোনসি হেন কাজ ॥' [পৃঃ ১০]
[বুড়ি, তোর বাপের লজ্জা নেই যে, এমন কথা আমাকে বলিস।]

খ) 'এহা বুলী বড়ায়িক চড়ে মাইল রোষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥' [পৃঃ ১০]

বঙ্গসমাজে বাল্য বিবাহ একটি সুপ্রাচীন প্রথা। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। রাধারও বিবাহ হয়েছিল শৈশবকালে। কৃষ্ণকীর্তনের জন্মখণ্ডে এই সম্পর্কে বর্ণনা আছে :

'দৈবেঁ কৈল কাহ্ন মনে জানী
নপুংসক আইহনের রাণী ॥' [পৃঃ ৩]

প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিবাহ যে যুগের সমাজে দুর্বনীয় ছিল। এরকম বিবাহে কি বিষময় পরিনতি হতে পারে, রাধার একটি বক্রোক্তি হতে তার প্রমাণ পাওয়া যায় :

'বুঝিল কাহ্নাঞি তোহ্মার বিরত
মিছা না করহ দাপে।
আছুক তোহ্মোর কথা হেন করতেঁ
নারে তোর বাপে ॥' [পৃঃ ৪০]

আবার একসময় রাধা অল্পবয়স্ক কৃষ্ণের প্রণয় ভিক্ষা লক্ষ্য করে তাঁকে সতর্ক করে বলছেন :

'উত্তম গোঅলে কুলে তোহ্মার জনম।
তোহ্মাকে জুগুত নহে এসব করম।' [পৃঃ ১১৮]

সেযুগের রমণী সমাজে বিবিধ অলঙ্কারের প্রচলন ছিল। এগুলির মধ্যে মাথায় মুকুট ; গলায়—সাতেসরী, গজমুতী এবং গুণিয়া বা সুতহার ; কানে—কুন্তল এবং হিরাধর (হীরক খচিত) কড়ী ; বাহুতে—বলয় ; হাতে—বাহুঠী, কনক কঙ্কণ, চুড়ি, আঙুঠী ; কটিতে—কিঙ্কিনী ; চরণে—নূপুর এবং পদাঙ্গুলিতে পাসনী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণকীর্তনের কবি ঐ অলঙ্কারগুলি দিয়ে রাধার বিবিধ অঙ্গ শোভিত করেছেন। এছাড়া রমণী সমাজে ফুলের সাজেরও প্রচলন ছিল। নানা ফুলের সাজে তারা দেহের শোভাবর্দ্ধন করত। গলায়, মাথায়, খোঁপায় এবং বাহুতে চাঁপা, মালতী, গুলাপ (বাবুই তুলসী) ও যুথিকা ফুলের মালা শোভা পেত।

প্রসাধন সামগ্রির মধ্যে ছিল, সিঁথীতে সিঁদুর, ললাটে কুঙ্কুম এবং চন্দনের তিলক, নয়নে কাজল এবং মুখে একধরনের মুখরঞ্জন। অবশ্য তাম্বুলেও মুখরঞ্জন চলত। তাম্বুলে থাকত কর্পূর, আতর, খদ্দর এবং পরজ।

ক) 'আগর চন্দন অঙ্গে মাখী
কাজলে রঞ্জিল দুই আখী ॥' [পৃঃ ১৩৭]

খ) 'ভৃঙ্গার ভরিআঁ নৈল জলে।
জটা ভরি কর্পূর তাম্বূলে। [পৃঃ ১৩৭]

রমণীরা গাত্রাবরণের বস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করত, রেশমী ও পাটের শাড়ী। শাড়ীর পাড় দু'টি নানা বর্ণচিত্রে ঐশ্বর্যময়। বসন হিসাবে কাঁচুলি ও উড়ানী ব্যবহারেরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাধার বসন কখনো নেতের (রেশম), আবার কখনো পাটের। শাড়ীর আঁচল ও পাড় মূল্যবান্ বস্তুতে খচিত। তাঁর অঙ্গে কখনো বিচিত্র রঙের কাঞ্চুলি বা কাঁচুলি, কর্ণে হীরক খচিত রতন কুন্তল। হাতে সোনার কঙ্কণ, কেয়ুর ইত্যাদি। প্রতিটি বস্তুই মূল্যবান। অবশ্য স্বচ্ছল না হলে স্ত্রীলোকেরা কখনো এই সমস্ত মূল্যবান অলঙ্কার ব্যবহার করতে পারে না।

তবে রমণীসমাজে সর্বস্তরে এরূপ সচ্ছল অবস্থা ছিল না। কোন কোন স্তরে মানুষের দুঃখ, দৈন্য, অভাব, অনটন, যন্ত্রণা ও হাহাকার ধ্বনি সীমা অতিক্রম করেছে। কৃষ্ণকীর্তনের রমণীসমাজে এই ধরণের চিত্র যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। কোথাও দারিদ্র্যক্লিষ্ট, আক্ষেপ-পীড়িত রমণীদের ম্লান মুখচ্ছবি, আবার কোথাও হতদরিদ্র ভিখারিণীর নীরব কাতরোক্তি, সকল চিত্রই পাঠক মনে দোলা দেয়, বিষাদময়তায় আচ্ছন্ন করে।

ক) 'পরধন দেখিলেঁ কি পাত্র ভিখারী।' [পৃঃ ২৪]

খ) 'হেনক্ কুমতী এঁ হরিবেঁ ভিখারী' [পৃঃ ৫৬]

গ) 'হাতে খাবার ভিখ মাঙ্গএ যোগিনী।' [পৃঃ ১২৫]

সমাজে দুর্ভাগ্যবতী রমণীদের দুঃখ কষ্টের অবধি ছিল না। রাধা নিজে এক সময় দুঃখ করে বলছেন :

'আহ্মে দুখমতী নারী আটক কপালী।' [পৃঃ ৩৮]

একটানা দুঃখ দুর্দশায় অতিষ্ঠ হয়ে কত অভাগিনী শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে অকালে জীবনাবসান ঘটিয়েছে। এরকম ঘটনাও 'কৃষ্ণকীর্তনে' রয়েছে, যথা—

'দিবওঁ পরাণ যোঁ করিবোঁ আত্মঘাতী।' [পৃঃ ৪০]

সমাজের অবস্থাপন্ন রমণীদের সাজসজ্জা, আচরণ ও আভরণ সম্পর্কে মোটামুটি একটা পরিচয় পাওয়া যায় কৃষ্ণকীর্তনে। তাদের বসন ভূষণ এবং অলঙ্কারগুলি মূল্যবান এবং সুদৃশ্যপূর্ণ। শুধু তাই নয়, অলঙ্কারগুলি সেযুগের মণিকারের শিল্পকৃতির পরিচয় বহন করে :

ক) 'প্রথমে কাড়িআঁ নৈম সাতেসরী হার।
কানের কুন্তল নিল মুকুট মাথার ॥' [পৃঃ ৫৩]

খ) গিয়ে গজমতী হার মনি মাঝে শোভে তার…পৃঃ [১৫১]

গ) 'বাহুতে কনক চুড়ী মুকুতা রতনে জড়ী
রতন কঙ্কণ করমূলে··· [পৃ: ১১০]

ঘ) "বাহুর বলয়া পত্র কাটী।
কানের হিরাধর কটী।।' [পৃ: ৪৫].

ঙ) 'হাতের বলয় নিলেঁ আঅর বাহুঠী
কনক কঙ্কন নিলেঁ আঅর অঙ্গুঠী
কনক কিঙ্কিনী নিলেঁ পএর পুহুর।
বচন সরস তোহ্মে হৃদয় নিঠুর।। [পৃ: ৫৩]

চ) 'আঅর কাচিয়া নিল গুনিআঁ গলার।' [পৃ: ৫৩]

ছ) 'বড় দুখ পাইল আহ্মে কাঢ়িতে পাসলী।' [পৃ: ৫৩]

রমণী সমাজে অনাচার, কদাচার, কুমতি ও দুর্মতি সকলই বিদ্যমান ছিল।

ক) 'হেন বুঝেঁ রাধাতোঁ করিলি কুচরীত।' (পৃ: ৮৭)

খ) 'না অত চাঢ়িনা রাধা আপন কুমতী।' (পৃ: ৬২)

স্বিচারিণী, স্বৈরিণী, কুলটা, ধৃষ্টা, পুরুষঘাতিনী ও লজ্জাহীনা রমণীদেরও বিবরণ পাওয়া যায় কৃষ্ণকীর্তনে :

ক) 'দুচারিণী যার মা তার হেন গতী।' (পৃ: ১১৮)

খ) 'রম্ভা আদি বেশ্যাক রমাস্থি ত্রিদেশে।' (পৃ: ২৬)

গ) 'নটকী গোআলী ছিনারী পামরী
সত্যে ভাব নাহিঁ তোরে। (পৃ: ১২৫)
(নটকী অর্থে ধৃষ্টা বা কুচ্ছোবতী) পৃ:

ঘ) 'লোকে হৈবোঁ মোত্রেঁ পুরুষবধী'। (পৃ ৪৫)
(পুরুষবধী অর্থে পুরুষ-ঘাতিন)

ঙ) 'এভহো নিলজী রাহী ছাড় মোর আশে (পৃ: ১৪৩)
(নিলজী অর্থে লজ্জাহীনা)

কৃষ্ণকীর্তনের লৌকিক সমাজে চোর রমণীরও বর্ণনা আছে :

'সব লোক মোরে ভালেঁ জানে।
চুরিনী হরিলাহোঁ তোর থানে।। (পৃ: ১২৮).

কতক ক্ষেত্রে সংসারে অতিষ্ঠ রমণীরা মাথা মুণ্ডন করে যোগিনীর বেশে নানা তীর্থে ঘুরে বেড়াত। যোগিনীর মতই তারা নরকপালি হাতে নিয়ে ভিক্ষা করত :

'মুণ্ডিআঁ পেলাই বোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।
যোগিনীর রূপ ধরি লইবোঁ দেশান্তর (পৃ: ১৩২)

মনের দুঃখ অসহ্য হলে পুরুষ বা রমণী অনলকুণ্ডে ঝাঁপ দিত ; কেউ বা বিষপান করে আত্মাহুতি দিত।

ক) 'অনে মরিবোঁ জানী বেগুনী। (পৃ: ১১৮)'

খ) 'কাহ্নত লাগিআঁ কিবা বিষ খাইআঁ মরিবোঁ।' (পৃ: ১২৫)

সমাজে অনাথা ও অসহায় রমণীদের ওপর পুরুষের জোর জুলুমের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে রাধার উক্তি উল্লেখযোগ্য :

ক) 'নিমাথি দেখিআঁ মোক বল করে কাহ্নে।' (পৃ: ৪৩)
(নিমাথি অর্থে অনাথা)

খ) 'পাঁওয়ে একসরী পাইলেঁ নিমাথিতী।' (পৃ: ১৭)
(নিমাথিতী অর্থে অসহায়।)

নৃত্য, গীত ও নাটকাভিনয়ের প্রচলন ছিল কৃষ্ণকীর্তনের প্রকৃত-সমাজে নর্তক নর্তকী সকলে অংশ গ্রহণ করত। বাদ্য যন্ত্রাদি সহকারে নৃত্য, গীত ও নাটকাভিনয় পরিবেশিত হত। গৃহস্থ রমণীরা দল বেঁধে প্রকাশ্য দিবালোকে মঙ্গল গীত গাইতে গাইতে পথ পরিক্রমণ করত। কৃষ্ণকীর্তনের কয়েকটি অধ্যায়ে এ বিষয়ের সবিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায় :

ক) 'ষোল শত গোপী গেলা যমুনার ঘাটে।
তা দেখি আঁ কাহ্নাঞি পাতিল নাটে' (পৃ: ১১৫)

খ) 'গো আলিনী আহ্মে নহোঁ নচুনী।' (পৃ: ৯৫)

গ) 'দামোদর জুড়িল নাচনে।' (পৃ: ৯৩)

ঘ) 'বৃন্দাবন মোর থানে।
বংশ বাজাওঁ গানে।।' (পৃ: ১৯)

ঙ) 'জাইতেঁ হরষিত মনে গায়িতে মঙ্গল।' (পৃ: ৫৪)
(নাটে শব্দ অর্থ নাট্যকলার অভিনয়)

গ্রাম্য রমণী সমাজে 'একঘরে' হয়ে পড়ার ভয় ছিল। ঘরের বৌ বা মেয়েকে পাড়ার সব পাঁচ-জন মেয়ের সঙ্গে হাটে না পাঠালে প্রতিবেশী গৃহিণীরা সেই মেয়েটার মা বা শাশুড়ীকে 'একঘরে' করার ভয় দেখাত। রাধার শাশুড়ী একদিন পুত্র-বধূকে হাটে যাবার অনুমতি না দিলে প্রতিবেশী গোয়ালিনীরা রুষ্ট হয়ে তাকে এক ঘরে করার ভয় দেখিয়েছিলেন :

'আপন আপন বহু হাটক পাঠাইব।
তোহ্মার ঘরত অন্ন পানি না খাইব।।' (পৃ: ৭৯)

স্বামী, পুত্র, শাশুড়ী, ননদ নিয়ে সংসার করত গৃহস্থ বধুরা। সংসারে শাশুড়ী-ননদের দাপট ছিল। গৃহবধুর অন্যায় দেখলে তারা তর্জন-গর্জন করতে ছাড়ত না। রাধার একটি উক্তি এখানে স্মরণ করা করা যেতে পারে :

'শাশুড়ী ননদী মোর ঘরে দরুবারে।
কোন ছলে যাব ঘর নই স্বতন্তরে।। (পৃ: ১৬২)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বিধৃত রমণী-সমাজের চিত্রগুলি একটি বিশেষ যুগের হলেও সেগুলি যুগবাহিত ধারায় বৈচিত্র্য হতে পৃথক নয়। সেই যুগেও শ্রেণী-সমাজ এবং বর্ণ বৈষম্যের অস্তিত্ব ছিল। জাতির

মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ, বৈষম্য, দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস সকলই অক্ষুণ্ণ ছিল। রমণীসমাজ নানা অন্যাচার, অনাচারে উৎপীড়িত ছিল। তাই সেখানে জীবন প্রকৃতির কোন বিকাশ লক্ষ্য করা যায় না। সেই সমাজে জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে সার্বিক মিলনের কোন প্রচেষ্টা নেই, নেই কোন মহতী আদর্শের অকুণ্ঠ প্রেরণা। ফলে, এই কালসীমায় রমণীসমাজ নবীনতর মুক্তির পথ খুঁজে পায়নি। অবশ্য এর জন্য ছিল তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ। দীর্ঘস্থায়ী তুর্কী আক্রমণের ফলে মানুষ তার আত্মবিশ্বাস হারিয়েছিল। যুগশক্তির প্রতি মানুষের কোন আস্থা ছিল। অগত্যা দেবীকৃপাকেই তারা জীবনরক্ষার একমাত্র সম্বল করেছিল। কৃষ্ণকীর্তনে এর নজীর আছে। মহাশক্তি জগজ্জননী চণ্ডীকার পূজায় রাধা সকলকে উৎসাহিত করেছেন, লোকসমাজে সোৎসাহে দেবীমাহাত্ম্য প্রচার করেছেন :

'বড় যতন করিআঁ চণ্ডীর পূজর্যা মানিআঁ
তবে তাঁর পাইবেঁ দরশন।' (পৃঃ ১৩৪)

তবে একথা সতত স্বীকার্য, কৃষ্ণকীর্তনে বিধৃত রমণীসমাজের জীবনানুভূতির চিত্রায়ণ ও সামাজিক সহৃদয়তাকে আশ্রয় করেই উত্তরকালের রমণীসমাজ অধুনিকতার পথে যাত্রা করেছিল।

উল্লেখ্যপঞ্জী

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত
(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ/১৩৫৬)
২। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়
৩। চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : ডঃ কৃষ্ণপদ গোস্বামী
৪। 'পুরাতনী' : শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত।

মহাভারতে দ্রৌপদীর মুখে লোকায়তবাদ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

এককালে পুরোহিত-তন্ত্রবাদের একচেটিয়া স্বার্থকে বজায় রাখতে বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সুপ্রাচীনকালের অনেক তথ্যই অ-ব্রাহ্মণের কাছে চিরকালের জন্য (?) অজ্ঞাত থেকে যায়। ইংরেজ আমলে এসে সব ভাষাই সকলের শিক্ষণীয়, এই নীতি চালু হলেও, তখন থেকে দেশের মানুষ, শুধু অর্থ-করী ভাষাই শিক্ষার সোপান এই নীতিকে বেশ আকড়াতে লাগলো। দেশীয় ভাষা এবং সুপ্রাচীন সংস্কৃত ভাষা এই দুটি যদিও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসার পথে চলতে লাগলো, তাও বর্তমান আমলে সংস্কৃত ভাষা স্কুল কলেজের প্রধানের মর্জির উপর ঝুলতে থাকার নির্দেশ এসেছে, ত্রিভাষার বোমায় শিশুপাল আহত হয়তো বা নিহত হবার শংকায়।

এদিকে অভাবনীয় পথে, লোকায়তবাদ, ভাববাদ, সংশয়বাদ, আচরণবাদ প্রভৃতি বাদগুলি যখন ভারতে প্রসার লাভ করেছে, তখন বিশিষ্ট মনীষীবৃন্দ বলেছেন—এসব মতবাদ ভারতে বহু আগেই প্রচারিত হয়েছে এবং তাই নিয়ে সাম্প্রদায়িক বাদানুবাদও ভারতে কম হয় নাই এবং এখনও সে সব চর্চার মৌলভিত্তি একটুও আলগা হয় নাই।

এই যে 'মহাভারত' এক বিরাট সাংগ্রামিক কাব্য, এর আদি পর্বে যেমন লোকায়ত মত অথবা চার্বাক মত কিংবা নাস্তিক্যবাদের কথাকাহিনী, তেমনি শেষের পর্বগুলিতে সশরীরে 'স্বর্গ' গমনও তেমনি বাস্তববাদের পথরেখা টানা হয়েছে।

থাক্ সে প্রসঙ্গ। কথা এই যে, লোকায়তবাদেরও উল্লেখ আদি পর্বেতো আছেই। এমন কি এই বাদটি বিশিষ্ট ঘরের মহিলারাও যে জানতেন তারও উল্লেখ দ্রৌপদীর মুখে শুনে তাঁর পাচ স্বামী এবং পণ্ডিতেরা একরকম মৌনই হয়েছিলেন। লোকায়তিক মতবাদ মানে জনগণ যা বুঝতে পারেন এমন যুক্তিবাদ।

আদি পর্বের ৭০ অধ্যায়ের একটি উপাখ্যান যেটি দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রসঙ্গ নিয়ে। গ্রন্থকার কৌশলে দেখিয়েছেন রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্রের এটা স্বাভাবিক অভ্যাস যে, তারা অসহায়ের কাছে, দরিদ্রের কাছে শরীর ও মানস শক্তিগুলির সব কিছুই কেড়ে নিয়ে ভোগ করে, আর কিছু পরেই তাদিকে আখের ছিবড়ের মত দূরে ফেলে দেয়। কিন্তু তাদের মধ্যেও দয়ালু উদার চরিত্রের লোকের উদ্ভব হয়।

ওই যে দুষ্মন্ত রাজা, এবং বিশ্বামিত্র মুনি, উভয়েই অতুল সম্পদের অধিকারী দুজনেই রাজা। তবে বিশ্বামিত্র পরে সর্বহারা স্বামীজী হয়েছিলেন। কিন্তু দেহের ভোগ লালসা পুরোদস্তুর ছিল, এবং আভিজাত্যের অভিমানও সর্বদা জাগরুক তাঁর। তাই সেই বিশ্বামিত্র ইন্দ্রের চক্রান্তে মেনকা নামে এক বহুভোগ্যা রমণীদেহের প্রতি গাঢ় আসক্তি, এবং পরে ভোগ লালসা পুরাদস্তুর মিটিয়ে যেদিন দেখলেন মেনকা গর্ভবতী, এবং সময়ে একটি কন্যা প্রসব করলো, সেই দিনই মেনকা এবং বিশ্বামিত্র সদ্যোজাত একটি কন্যাকে বনে ফেলে রেখেই উভয়ে উভয়ের খ্যাতিকে বজায় রাখতে পলায়ন করলেন।

নিষ্ঠুরতার চরম নিদর্শন রাখলেন। সামাজিক ভদ্রচেতনাও হারিয়ে গেল তাদের।

কিন্তু জনসম্পর্কশূন্য বৃদ্ধ কণ্বমুনি মেয়েটিকে দেখা শোনা করতে লাগলেন। দয়া ও উদারতার প্রেরণা পেয়েই সে কাজ করলেন। কিন্তু মেনকা রমণী হয়েও তা পারেন নাই এবং তপস্যা, জপ, তপ, বেদ পাঠ প্রভৃতি করেও বিশ্বামিত্র নিষ্ঠুর সামন্ততন্ত্রের মেজাজ ছাড়েন নাই।

এদিকে অসহায় শিশু কন্যাটি শকুনি পক্ষীর আশ্রয়ে ছিল বলেই কণ্ব মুনি তার নাম রাখলেন 'শকুন্তলা'। বেশ কিছুকাল কেটে গেল, শকুন্তলার তখন যৌবন, কিন্তু মানুষের সমাজ আর বন অরণ্য দুএর তফাৎ ততক্ষণ, যতক্ষণ না শোষক বঞ্চক নরপতির দৃষ্টি সেখানে না পড়ে!

কিন্তু বিশেষ দেরী হলো না শকুন্তলার প্রস্ফুটিত যৌবনের আকর্ষণে এক শিকারী নরপতির সেখানে আসতে, যিনি এলেন তার নাম দুষ্মন্ত। তিনি যখন কণ্ব মুনির আশ্রমে এলেন, তখন পার হয়ে এলেন মালিনী নদী, নদী পার হয়েই কাশ্যপের আশ্রম। আশ্রমের এক এক কুঠিতে তখন নানান্ শাস্ত্রের আলোচনা চলছিল, তাদের মধ্যে একটি কুটিরে শুনলেন বৌদ্ধমতের প্রবর্তক 'লোকায়তিক' মত। রাজা কান পেতে শুনলেন—

না না শাস্ত্রেষু মুখ্যৈশ্চ শুশ্রাব স্বনমীরিতম।
'লোকায়তিক' মুখ্যৈশ্চ সমন্তাদনুনাদিতম্॥

মহাভারত।আদিপর্ব।৭০ অধ্যায়।৪৬ শ্লোক

লোকায়ত মতটি সেকালে এমন প্রচারিত ছিল যে একটু লেখাপড়া জানা মেয়েরাও জানতেন। সে মতটি কুলবধূ দ্রৌপদীও জানতেন। তাই, দেখতে পাই মহাভারতের বনপর্বের ৩০ অধ্যায়টি 'লোকায়তমতেরই সার সংকলন'।

পঞ্চপাণ্ডব তখন দ্বৈতবনে উপস্থিত। একমাত্র যুধিষ্ঠিরের অসাবধনতার জন্যই যে তাঁদের বনে বনে কাটাতে হচ্ছে, এটা অন্যান্য ভাই এবং পত্নী দ্রৌপদী ভাল করেই জানতেন। তাঁরা, সুযোগমত একথাটা জানাবার ইচ্ছাতেই ঐ দ্বৈতবনে একদিন সন্ধ্যায় একত্র মিলিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে নিজের নিজের অভিমত বলে দিলেন, যে আপনার আনুগত্য আমরা পালন করে আসছি কিন্তু আপনি এ বিষয়ে আমাদের অন্তরের ইচ্ছা কি, সে বিষয়ে জানার একটু আগ্রহও প্রকাশ করেন নাই। তাই আজ আপনাকে শোনাতে চাই। যুধিষ্ঠির মৌন হয়েই সম্মতি জানালেন।

দ্রৌপদী বল্লেন, আমি প্রথমেই আপনাকে বলতে চাই যে, আপনি যে সর্বদা ক্ষমাগুণের প্রশংসা করে থাকেন, সেটার পিছনে কি আছে? যারা ধর্মের কথা শুনিয়ে শুনিয়ে মানুষকে মোহগ্রস্ত বা নেশাখোর করে দিয়ে, তার অর্থ, সম্পদ, কেড়ে নিয়ে যুক্তিহীন করে ক্ষুদ্র করে দেয়, তাদের প্রতি ক্ষমা করা কোন ধর্মের অন্তর্গত?

আপনি যে এত দান, ধ্যান, ত্যাগ, ঔদার্য, সত্যবাদিতা, সরলতা প্রকাশ করে এত উৎকৃষ্ট কাজ করেও এই ভাবে ভিখারী হয়ে আমাদিগকে নিয়ে কোনদিন উপবাসে, কোনদিন শাকপাতি খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন, এর জন্য কি আপনারই জ্ঞাতসারে কোন দুষ্কর্ম দায়ী নয়?

পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মফলই কি আপনার এই জড়তা, অজ্ঞানতা এবং ধর্মের নামে অযৌক্তিক মোহ সংস্কার এনে দিয়েছে?

এই যে এত সব বিদ্যা, জ্ঞান, কর্মশক্তি, অতুল দান, যজ্ঞাদি কার্য করলেন, তাদের ফল কি জন্মান্তরের জন্য তোলা রইল? তাহলে বলুন যাঁরা কেবল কথা বলে বলে কেবলই যজ্ঞ, দান প্রভৃতি পুণ্য কর্মের স্তব স্তুতি করে থাকেন, আর অজ্ঞানতা বশতঃ ধর্মের মহাত্ম্য শ্রবণ করেন তাঁরা কি বুঝতে পারেন না যে, এই ভাবে মোহ সৃষ্টি করে আত্মাকে ইনি ঠকাচ্ছেন?

এই যে আপনি ঋষিদের পক্ষে কোন আহ্বানই প্রত্যাখ্যেয় নয় শুনে পাশা খেললেন আর এমন গুণের আধার ভাইদের বাঁধা রেখে ক্রুদ্ধ দুর্যোধনেব কাছে সব হারিয়ে পথের ভিখারী হলেন এর জন্য কি আপনার মোহসংস্কার দায়ী নয়?

এ কোন ধর্ম? যিনি নিজের নিবুদ্ধিতাকে ধর্মের আনুগত্যের ফল বলে মনে করে আত্মীয়কেও বাঁধা রেখে এখনও ধর্মের মাহাত্ম্য গান এবং দেবদেবীদের স্তবস্তুতির পুরাতন গীতিগাথা শুনে শুনে নিরন্ন ভিক্ষুকের জীবনধারণ করছেন এও কি জন্ম কর্মের ফল?

তাহলে পুরোহিত যিনি, তিনি তো ইহজন্মে কোন যজ্ঞ, দান, গোমেধ যজ্ঞ, মুনি ঋষিদের সুবর্ণপাত্র দান করছেন না। তিনি তা জেনেও ইচ্ছা করে পরজন্মে মহান্ দরিদ্র ভিক্ষুক হতে চাচ্ছেন? এত মন্ত্র এত স্তব স্তুতির কথা শুনিয়ে শুনিয়ে পুরোহিত কেন এখনও ভিক্ষার দারিদ্র্যকে সহ্য করছেন? ওই যে দুর্যোধন! ওতো কোনদিন স্বাহাকার, স্বধাবচন করে না, তবুও কেন সসাগরা ধরিত্রীর সাম্রাজ্য ভোগ করছে?

দুর্যোধন তো ঋজুতা মৃদুতা বদান্যতা লজ্জাশীলতা সত্যবাদিতার ধারে কাছেও যায় না, সেটাকি জন্মকর্মের ফল পেয়েও—সাম্রাজ্য ভোগ করার দিক থেকে এতটুকু কমতি হল না তার?

দুধর্ষ ব্যক্তির প্রভুত্ব করাটাও কি ঈশ্বরের বিধান? আর যিনি সংস্কারবদ্ধ ধর্মের আনুগত্যের নামে নিজের মূঢ়তাকে বাড়িয়ে চলেছেন, আর প্রতিপদক্ষেপে বিনয়, ক্ষমা, ধৈর্য ধারণ করে করে অনুগত যারা তাদিকে সবদিক থেকে মূঢ়তা, জড়তা, নৈষ্কর্মবতী করার চেষ্টা করছেন এসবও ঈশ্বরের বিধান?

আপনি বলুন, মানুষ নিজের কল্যাণলাভের জন্য নিজের বুদ্ধির সাহায্যে দেশ কাল উপায় এবং সকলের মঙ্গলের জন্য যে সব কার্যসাধন করে, সেগুলি কি নৈষ্কর্ম সাধকের কাজ? না কি কেবল ধর্মীয় মাহাত্ম্য শোনার কাজ?

বুদ্ধি পরাক্রমই তো সকল কর্মফললাভের ফল! আর একথাও সত্য যে, যে ব্যক্তি নিজের অবমাননা সহ্য করে সংস্কারগত ঐতিহ্যের দাসত্ব করে সে কি কোন সময় নিজের বা অপরের এতটুকুও ঐশ্বর্য লাভ করতে পারে?

আপনি ধর্মের দোহাই দিয়ে দিয়ে কেবল জড়তাই সৃজন করেছেন, অর্জুন প্রভৃতির মনীষা কি সহ্য করবে?

এই যে কথা বললাম, সেগুলি আমার বাবার বাড়িতে থাকার সময়ই শিক্ষা করেছিলাম। একজন পণ্ডিতকে বাবা দীর্ঘদিন বাড়িতে রেখে, তিনিই বৃহস্পতির শাস্ত্র যুক্তিটা শিক্ষা দিতেন"—

'ব্রাহ্মণং মে পিতা পূর্বং বাসয়ামাস পণ্ডিতম্'
সোঽপি সর্বামিমাং প্রাহ পিত্রে মে ভারতর্ষভ।

নীতিং বৃহস্পতিপ্রোক্তাং ভ্রাতৃন্ গ্রাহয়ৎ পুরা।
তেষাং সকাশাদশ্রৌষমনমেতাং তদা গৃহে ॥

মহাভারতাবন পর্ব।৩০-৩২ অধ্যায়।

দ্রৌপদী যে লোকায়তিকবাদের উত্থাপিত যুক্তিগুলি স্বামী যুধিষ্ঠিরকে শুনিয়েছেন সেটি বৃহস্পতি প্রোক্ত।

সেই বৃহস্পতির মতবাদই ভারতে সংশয়বাদ, অজ্ঞেয়বাদ, জয়রাশির তত্ত্বোপপ্লববাদ, বিতণ্ডাবাদ, প্রাত্যক্ষিক প্রমাণবাদ, স্বভাববাদ, দেহাত্মবাদ, ভূতচৈতন্যবাদ ইন্দ্রিয়বাদ, প্রাণাত্মবাদ, মন আত্মবাদ, এবং চার্বাকবাদ ; এই এতগুলি নামে চলছে। মূলে সেই বৃহস্পতির মতবাদই।

স মা লো চ না

ভারতের জনসংখ্যা ॥ অতীন্দ্রমোহন গুণ : জিজ্ঞাসা, কলকাতা। মূল্য ৭ টাকা

আমরা, অর্থাৎ ভারতবাসীরা এত গরীব কেন ? কেন আমাদের দেশের অর্ধেক মানুষের দুবেলা খাবার জোটে না ?—এ প্রশ্ন নিয়ে নানা তর্ক হতে পারে। কেউ বলেন এটা উপনিবেশিক শোষণের ফল। বিদেশী রাষ্ট্র আমাদের দখল করেছে নিজেদের স্বার্থে—এটা ঠিকই। কিন্তু লাতিন আমেরিকার অনেক অনেক দেশ এবং দুনিয়ার আরও দু একটি দেশে কখনও উপনিবেশ ছিল না, তবু তারা গরীব। কেউ বলেন এদেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আছে তাই আমরা গরীব (পশ্চিমবাংলায় এই ব্যাখ্যাটা চালু বেশী)। কিন্তু এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া আর জাপানেরই অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়েছে সবচেয়ে দ্রুত হারে, কিন্তু এই দুটি দেশ পুঁজিবাদী পথেই এগিয়েছে। গরীবীর নানা কারণ—জনসাধারণের স্বভাব, প্রশাসন এবং অন্যান্য কারণের সাথে একটা প্রধান কারণ হচ্ছে লভ্য সম্পদের অনুপাতে জনসংখ্যা বেশী বেড়ে যাওয়া।

এই জনসংখ্যার সমস্যাটি আবার পিছিয়ে পড়া দেশগুলিতে বেশী তীব্র এবং এটা বেশী তীব্র ভারতের মতো কয়েকটি দেশে। ডঃ অতীন্দ্রমোহন গুণ তাঁর ছোট্ট বইটিতে ভারতের জনসংখ্যার এই বিরাট সমস্যাটি নিয়ে নানা দিক থেকে আলোচনা করেছেন। তিনি নিজে সংখ্যাতত্ত্বের প্রবীণ অধ্যাপক, কিন্তু পাণ্ডিত্যের কচকচিমুক্ত এই সরস বইটিতে এই সমস্যাটি তিনি অতি চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ভূমিকার পরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ইতিহাস, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায়, জন্মশাসনের পদ্ধতি, ভারতের জনসংখ্যানীতি, অন্যদেশে পরিবার পরিকল্পনা, ম্যালথুসীয়নীতি এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রশ্ন, আর শেষে আমাদের কর্তব্য—এই সাতটি অধ্যায়ে তিনি এই কাজটি সেরেছেন।

পৃথিবীর মোট ভূভাগের মাত্র ২·৪ শতাংশ আছে ভারতে ; কিন্তু এদেশের ভাগে পড়েছে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১৪ শতাংশের বেশী। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই চীনের কথা মনে আসে। কিন্তু চীনের মাথাপিছু খাদ্যশস্য উৎপাদন বিপ্লবের আগেই আমাদের চেয়ে বেশী ছিল এবং আজকের শিল্পোন্নতির সবচেয়ে জরুরী দরকার পেট্রোলিয়াম যার জন্য ভারতের সত্তর ভাগের বেশী বিদেশী মুদ্রা চলে যায়, তা চীনে অনেক আছে—এটা ভূমিকায় ডঃ গুণ জানালে ভালো করতেন। বিশ শতকেই এদেশে জনসংখ্যা ভীষণভাবে বাড়ে যাকে 'জনসংখ্যা বিস্ফোরণ' বলা যায়। কারণ জন্মহার না বাড়লেও আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার কল্যাণে মৃত্যুহারের দ্রুত হ্রাস ঘটেছে। আর তাই এদেশে প্রতি বছর ১ কোটি ৩০ লক্ষের মতো মানুষ বেড়ে যাচ্ছে—যা কিনা অষ্ট্রেলিয়ার মোট জনসংখ্যার সমান। এত বিপুল সংখ্যক মানুষের খাবার, কাপড়, চাকরি জোগাড় করা আমাদের পক্ষে যে বিরাট বোঝা তা

যে কোন সাধারণ বুদ্ধির মানুষই বুঝবেন। এদেশের যৌথ পরিবার, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি, দৈববাদী মানসিকতা—এ সবই জন্মহার বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল। যুবক চাষীর ছেলে জন্মালে তা পুরো পরিবারের সৌভাগ্য বলে মনে করা হয় আর চাষী ভাবে সাতজন জন্মালে মরে গিয়ে চারজন থাকলেও তার বুড়ো বয়সের ভাতকাপড় জুটবে। শহরে মধ্যবিত্ত ছেলেদের মতো তাদের স্কুল-কলেজে পড়তে হয় না—অল্প বয়স থেকেই তারা ক্ষেতের কাজে সাহায্য করে। তাছাড়া আমাদের যে শতকরা সত্তর ভাগ মানুষ গাঁয়ে থাকে তাদের দর্শন হচ্ছে 'জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি'—অতএব মানুষ পরিকল্পনা করে ভগবানের লীলা ঠেকাবে কি করে? তাই উদাসীনভাবে তারা বাচ্চা তৈরী করে এবং দেশের বোঝা বাড়ায়।

'জন্মশাসনের বিভিন্ন পদ্ধতি' অধ্যায়ে ডঃ গুণ অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতো এর নানা পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন।

জাতীয় জনসংখ্যানীতির ক্ষেত্রে আমাদের দেশের অনুসৃত নীতির সাথে দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, জাপান প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যা নীতির কথা লেখক জানিয়েছেন। দক্ষিণ কোরিয়ার জনঘনত্ব আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। এটিও কৃষিপ্রধান দেশ। কী ভাবে ১৯৬০ সালের পরে পরিবারপরিকল্পনা সুরু করে সেদেশ জন্মহার কমিয়ে এনেছে তা একটা তাজ্জব ব্যাপার। সরকারী প্রশাসন-যন্ত্রকে পুরো কাজে লাগিয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর একটা বিরাট দল নিয়োগ করে এবং সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেই এটা সম্ভব হয়েছে।

আমার মনে হয় সরকারী কর্মচারীদের অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশকে ফাইল ঘাঁটাঘাঁটির কাজ থেকে সরিয়ে এনে প্রশিক্ষণ দিয়ে ওরকম একটি দল তৈরী করে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দিলে কিছু কাজ হতে পারে। অবশ্য ডঃ গুণ জবরদস্তির পক্ষে নয়। সঞ্জয় গান্ধীর জবরদস্তির ফলে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব দেখা দিয়েছিল; তার ফলে জনতা আমলে জন্মশাসনের অভিযান পিছিয়ে পড়েছিল। ১৯৮১-র জনগণনার তথ্যাদি বেরোবার পর অনেক রাজনৈতিক দলই আবার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কথা বলছে—কিন্তু ভোট হারাবার ভয়ে কেউ জোর দিয়ে কিছু বলছে না। এমন কি চীনের মতো একদলীয় শাসনের দেশেও জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জবরদস্তি করতে নেতারা বারণ করছেন।

শেষে একটি অপ্রিয় কথা বলতে হয়। ডঃ গুণের মতে গোঁড়া মার্কসবাদীরা এই ধরণের পরিকল্পনায় বাধা দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, গোঁড়া গান্ধীবাদীরাও এই দোষে সমান ভাবে দোষী। গান্ধীজীর সায় ছিল সংযম পালনের দিকে যা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মার্কস যেহেতু ম্যালথাসের সমালোচনা করেছিলেন তাই মার্কসবাদীরা এর বিরুদ্ধে (অবশ্য নেতারা নিজেরা জন্মনিয়ন্ত্রণ করেন, ঠিক যেমন সাধারণ শিক্ষকের ইংরাজী উঠিয়ে দিয়ে নিজেদের সন্তানদের ইংরাজী মিডিয়াম স্কুলে দেন)। চীনে কিন্তু নেতারা পুরোদমে জন্মনিয়ন্ত্রণ চালু করেছেন, কারণ ওঁরা বাস্তব বাদী। পরিবার পরিকল্পনানীতিকে সার্থক করতে হলে গ্রামের দিকে যেমন দৈববাদী 'মা ষষ্ঠীর

কৃপা' মার্কা অন্ধতার বিরুদ্ধে লড়তে হবে—শহরে তেমনি রাজনৈতিক মতান্ধতার বিরুদ্ধে লড়াই দরকার।

পরিশেষে দু একটি ত্রুটির কথা বলি। ছাপার হরফ আর একটু বড়ো হলে ভালো হতো। ৪৮শ পৃষ্ঠায় 'ভারতীয় পরিবার পরিকল্পনা সমিতি'—কথাটিতে 'সমিতি' পদ পড়ে গেছে। এরকম মুদ্রণ-ভ্রান্তির জন্যে একটি শুদ্ধিপত্র থাকলে ভাল হয়।

সব মিলিয়ে বইটি স্বল্প আয়তনের মধ্যে চমৎকার হয়েছে। ডঃ গুণের মতো বিশেষজ্ঞরা দেশের প্রধান সমস্যাগুলি নিয়ে যদি এ ধরণের বই লিখে সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন তাহলে একটা বড়ো কাজ হবে। একাজের সহযোগিতার জন্যে জিজ্ঞাসা প্রকাশনকে ধন্যবাদ জানাই।

মনোজ দত্ত

শব্দের জগৎ : শ্রীপার্বতীচরণ ভট্টাচার্য। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা-২৯, মূল্য : ছয় টাকা।

আচার্য সুনীতিকুমার, সুকুমার সেনের পর বাংলা ভাষাতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা গবেষণা ও আলোচনায় সফলকাম হয়েছেন, অধ্যাপক শ্রীপার্বতীচরণ ভট্টাচার্য তাঁদের অন্যতম। ভাষাতত্ত্বের মত দুরূহ ও নীরস বিষয়ের প্রতি আজকাল ছাত্রসমাজের যেটুকু প্রীতি ও আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়, তা অধ্যাপক ভট্টাচার্যের ন্যায় ভাষাবিদ্‌দের মনোগ্রাহী আলোচনা ও সরস ভঙ্গিতে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ রচনাই যে তার প্রমাণ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 'বাংলা ভাষা' নামক গ্রন্থ রচনার পর অধ্যাপক ভট্টাচার্যের সম্প্রতি প্রকাশিত 'শব্দের জগৎ' গ্রন্থটি বাংলা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থের সীমানা আরো অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। গ্রন্থটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও অন্তরের ঐশ্বর্যে যে বৃহৎ তা কোনমতেই অত্যুক্তি নয়।

'শব্দের জগৎ' গ্রন্থটিতে সাতটি পরিচ্ছেদ আছে। প্রতিটি পরিচ্ছেদই স্বয়ংসম্পূর্ণ অথচ পরস্পরের পরিপূরক। রচনার এমনই কৌশল যে স্বতন্ত্র বা খাপছাড়া এক একটি প্রবন্ধ বলে মনে হয় না। প্রথম থেকে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বিধৃত রচনাগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত যোগীন্দ্রমোহিনী স্মারক বক্তৃতামালা হিসাবে পঠিত হয়েছিল। আর সপ্তম পরিচ্ছেদে বিধৃত রচনাটিও আলোচিত হয়েছিল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। তখনই এই রচনাগুলি গুণীজনসমাজে সমাদৃত হয়। এই সব বক্তৃতারই সুসজ্জিত ও সুসংস্কৃত রূপ 'শব্দের জগৎ।'

'শব্দের জগৎ' গ্রন্থে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে তা এই রূপ : বাক্ ; ভাষা ; বিকিরণ ও স্বীকরণ ; ভুবনভ্রমণে ভ্রাম্যমান শব্দ ; বুৎপত্তি ও লোকবুৎপত্তি ; তিন দেশের তিন নদী ; চিরপ্রবাসীর করুণ ক্রন্দন এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ ও বাংলা ব্যাকরণ।

অধ্যাপক শ্রীপার্থচন্দ্র ভট্টাচার্য যে কেবল শুষ্ক গবেষক পণ্ডিত নন, সুরসিক সাহিত্যবেত্তা তা তাঁর কয়েকটি পরিচ্ছেদের নামকরণে প্রত্যায়িত হয়। শব্দের অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়ে এক বিচিত্র শব্দের জগৎ নির্মাণ করেছেন অধ্যাপক শ্রীভট্টাচার্য। শব্দের যে কত রূপ, রং ও রহস্য এবং সমগ্র পৃথিবীব্যাপী মানবসমাজে এই সব শব্দের কত বিচিত্র প্রয়োগ ও পদ্ধতি গ্রন্থের প্রতিটি পাতায় তা দেখানো হয়েছে। জটিল তত্ত্বকথাও যে কত সহজে বোঝানো যায় এবং ঘরোয়া বৈঠকে মজলিশী মেজাজের আমেজে রচনা যে কত আন্তরিক হতে পারে, তা 'শব্দের জগৎ' না না পড়লে অনুধাবন করা সম্ভব হবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটা উদ্ধৃতি দিলেই আমার বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে—'রাইস্' ও 'কারি' শব্দ দুটি শুনলেই বিদেশী বলে মনে হয়। দুটি শব্দই দক্ষিণ ভারতীয়। তামিল ভাষায় Arese আরেসে মানে ভাত স ওদনঃ বা ভক্তম্। ভত্তুলভোজী। দক্ষিণ ভারতে Rice হয়ে ভূবন ভ্রমণ করছে। Curry-ও তাই। তামিল 'কায়কারেই' মানে রান্না করা সব্জী। আর 'কারেই' অপভ্রংশ আনাজ। যাকে বলা হয় বাংলায় ঝোল, তা অবশ্য অষ্ট্রীক মূল, তা হচ্ছে উত্তর-পশ্চিম ভারতে গুররা, তার মূল মধ্য-এশীয় ভাষা। সংস্কৃতে হোল সুপ।'

'শব্দের জগৎ' অধ্যাপক শ্রীভট্টাচার্যের ভাষা-বিজ্ঞানের গভীর জ্ঞান ও অতন্দ্র রসসাধনার পরিচায়ক। 'জিজ্ঞাসা'র মত অভিজাত প্রকাশক এই জাতীয় মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রকাশ করে বাঙালী বিদগ্ধ জনের নিকট যে বিশেষভাবে ধন্যবাদভাজন হবেন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

অধীর দে

তে হি নো দিবসাঃ

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ঘটনাবলীর বিশেষ করে শিক্ষাজগতের সত্যনিষ্ঠ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তথ্যসহ সমালোচনা করেছেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির আচরণও আলোচিত হয়েছে। [৪০.০০]

ঠাকুরবাড়ীর কথা

ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। সংশোধিত পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। ঠাকুরবাড়ীর দু'শ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত। [২৫.০০]

বৈষ্ণব পদাবলী

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত চার হাজার পদের আকরগ্রন্থ। টীকা ও শব্দার্থ সঙ্কলিত [৭৫.০০]

ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। সাহিত্য একাদমী পুরস্কার প্রাপ্ত। [৩০.০০]

সা হি ত্য সং স দ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ।। কলিকাতা ৭০০ ০০৯

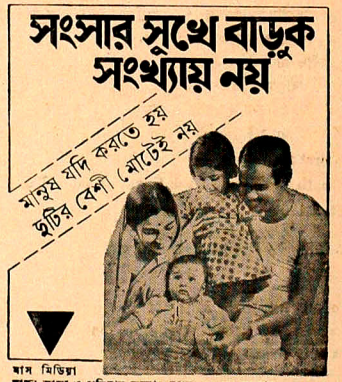

Advt No. 151/84-85